স্কয়ার

স্বাস্থ্য এবং ওষুধ বিষয়ক সাময়িকী

২১ তম বর্ষ
২০১৯

- ডেঙ্গুজ্বরঃ আতঙ্ক না সচেতনতা
- কিডনীরোগ ও জটিলতা
- মাথাব্যথা
- গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস
- জরায়ুর ক্যান্সার
- রিকেটস

ISSN 1682-0541

স্কয়ার
ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড
বাংলাদেশ

CERTIFIED ISO 9001 COMPANY

সূচী

ডেঙ্গুজ্বরঃ আতঙ্ক না সচেতনতা	.... ০১
কিডনীরোগ ও জটিলতা	.... ০৩
মাথাব্যথা	.... ০৪
গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস	.... ০৮
জরায়ুর ক্যান্সার	.... ১০
রিকেটস	.... ১৩
কয়েকটি ওষুধের ব্যবহার ও বিধিনিষেধ	.... ১৫

সম্পাদকীয়

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ

এ বছরের বাংলা “স্কয়ার” আপনাদের হাতে যথাসময়ে পৌছে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। বর্তমান সংখ্যায় আমরা বেশ কয়েকটি সম-সাময়িক এবং জরুরী স্বাস্থ্য সমস্যা তুলে ধরেছি। সমাজে সচেতনতা বাড়ানো এবং পাশাপাশি সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই আমাদের এ প্রচেষ্টা। আশা করি, এ সংখ্যায় আলোচিত বিষয়গুলো আপনাদের কাজে আসবে। আপনাদের সুচিন্তিত মতামত জানালে আমরা অনুপ্রাণিত হব।

পরিশেষে “স্কয়ার” পরিবারের পক্ষ থেকে আপনার এবং আপনার পরিবারের সবার সুস্বাস্থ্য ও শুভ কামনা করছি।

শুভেচ্ছাসহ

ডাঃ ওমর আকরাম-উর রব

২১তম বর্ষ, ২০১৯

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
ডাঃ ওমর আকরাম-উর রব

নির্বাহী সম্পাদক
ডাঃ মোঃ মাহফুজুর রহমান সিকদার

সহযোগী সম্পাদকমন্ডলী
ডাঃ ধ্রুবজ্যোতি রায় চৌধুরী
ডাঃ রেজাউল হাসান খান
ডাঃ রুবাইয়াত আদনান
ডাঃ মোঃ মাহবুবুর রহমান
ডাঃ রাশেদ আহমেদ

সহযোগিতায়
প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ISSN 1682-0541
Key title: Skayara

ডেঙ্গুজ্বরঃ আতঙ্ক না সচেতনতা

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্য সমস্যার সবচেয়ে বড় কারণটির নাম ডেঙ্গুজ্বর। জ্বর হলেই মানুষ এখন ডেঙ্গু আতঙ্কে ভুগছেন। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮০ হাজার ছাড়িয়েছে। বেসরকারী হিসাবে ডেঙ্গু জ্বরে মৃত্যুর সংখ্যা দেড়শরও বেশি। অন্যান্য বছর শুধু ঢাকাতে সীমাবদ্ধ থাকলেও এবার তা গ্রামগঞ্জে ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে। এবছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত মোট রোগীর ৪৪ শতাংশই ঢাকার বাইরে। আগস্ট মাসের তুলনায় সেপ্টেম্বর মাসে নতুন রোগীর সংখ্যা কমে এলেও ঢাকার বাইরের কয়েকটা জেলার গ্রামাঞ্চলে তা বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলে মশা নিয়ন্ত্রণ বা নিধন কঠিন বিধায় এর প্রকোপ বেড়েই চলেছে। বাংলাদেশ ছাড়াও এবছর শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরে ডেঙ্গু ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। বর্ষাকালে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি, বিশেষ করে ঢাকায়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে বৃষ্টি পরবর্তী সময়ে খুব অল্পতে ঢাকা শহরে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থার বেহাল দশা, যত্রতত্র ময়লা- আবর্জনা ফেলা, দক্ষ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ও অপরিকল্পিত নগরায়ন এই জলাবদ্ধতার কারণ। আর বদ্ধ পানিতেই এডিস মশা বংশ বিস্তার করে।

ডেঙ্গু যেভাবে ছড়ায়

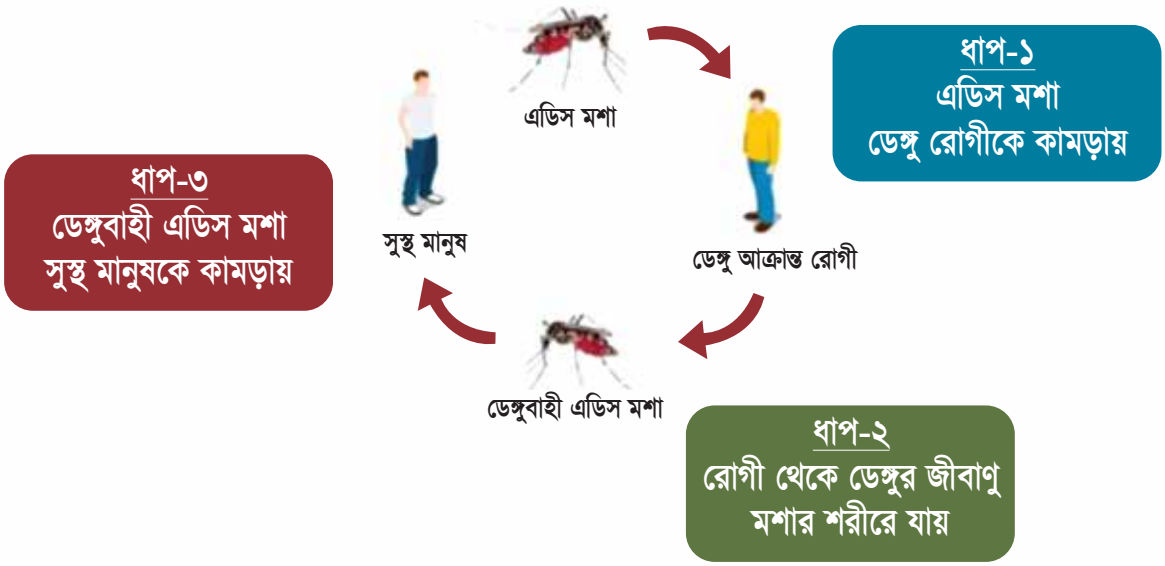

ডেঙ্গুজ্বর এডিস মশাবাহিত একটি ভাইরাল জ্বর। এই মশারাই তাদের শরীরে বহন করে বেড়ায় ডেঙ্গু রোগের জীবাণু। এই জীবাণুর নাম ডেঙ্গু ভাইরাস বা ফ্লাভি ভাইরাস। এর পাঁচটি সেরোটাইপ আছে। সেগুলো হল- $DENV_1$, $DENV_2$, $DENV_3$, $DENV_4$ এবং সম্প্রতি পাওয়া গেছে $DENV_5$। দুই ধরনের এডিস মশা ভাইরাসগুলো বহন করে থাকে।

১. এডিস ইজিপটাই (Aedes aegypti)
২. এডিস এলবোপিক্টাস (Aedes albopictus)

কিভাবে ছড়ায়

ডেঙ্গু ভাইরাস বহনকারী এডিস মশা কাউকে কামড় দিলে ঐ ব্যক্তি ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হবেন। এবার সদ্য জন্মানো এডিস মশা যার শরীরে ডেঙ্গু জীবাণু নেই, সেটি সেই ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তিটিকে কামড় দিলে ডেঙ্গুজ্বরের জীবাণুবাহী মশায় পরিণত হয়। এই মশাটি আবার কাউকে কামড় দিলে তিনিও ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হবেন। এভাবেই জীবাণুবাহী এডিস মশার কামড়ের মাধ্যমে রোগটি ছড়িয়ে পরে। মনে রাখতে হবে, ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত যেকোনো ব্যক্তিই রোগটি ছড়ানোর প্রধান উৎস। সেক্ষেত্রে রোগটি ভাল না হওয়া পর্যন্ত রোগীকে অবশ্যই মশারীর ভিতর রাখতে হবে যাতে তার থেকে রোগটি আর না ছড়ায়।

উপসর্গ

ডেঙ্গুজ্বরের প্রধান দুইটি ধরন হলঃ

১. লক্ষণবিহীন ডেঙ্গুজ্বর ও
২. লক্ষণযুক্ত ডেঙ্গুজ্বর

আগে ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পেত। এবার তেমন লক্ষণ ছাড়াই মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে, দৃশ্যমান বা লক্ষণযুক্ত ডেঙ্গু হলে কিছুটা বোঝা যায় এবং সে অনুযায়ী চিকিৎসা নিয়ে সুস্থও হওয়া যায়। কিন্তু লক্ষণবিহীন ডেঙ্গু ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নিজেও বুঝতে পারে না যে তারা এই রোগে আক্রান্ত। পরে এই ব্যক্তিরাই কিন্তু অসম ডেঙ্গু ভাইরাসে (যেমন- প্রথম আক্রমণ ডেঙ্গু ১, ডেঙ্গু ২, ডেঙ্গু ৩, ডেঙ্গু ৪, বা ডেঙ্গু ৫, ইত্যাদি) আক্রান্ত হলে তাদের অবস্থা জটিল হতে পারে। তরুণ ও শিশুদের ক্ষেত্রে এরকমটি বেশি ঘটে। অন্য কোন উপসর্গ এমনকি জ্বরও থাকেনা।

লক্ষণযুক্ত ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে মশা কামড়ানোর ২ থেকে ৭ দিন পর উপসর্গগুলো স্পষ্টভাবে লক্ষণীয় হয়। জ্বরের মাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ বেড়ে যায়। জ্বর ১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠতে পারে। রোগটির কিছু সাধারণ উপসর্গ হল বিরামহীন মাথাব্যথা, হাড়, হাড়ের জোড় ও পেশীতে তীব্র ব্যথা, বমিভাব বা বমি হওয়া, গ্রন্থি ফুলে যাওয়া,

সারা শরীরে ফুসকুড়ি দেখা দেওয়া, চোখের পিছনে ব্যথা হওয়া ইত্যাদি। প্রথমদিকে ১০৪ ডিগ্রী ফারেনহাইটের বেশি জ্বর থাকে। এর সঙ্গে থাকে সাধারণ ব্যথা ও মাথাব্যথা। এটি সাধারণত ২ থেকে ৭ দিন স্থায়ী হয়। এই পর্যায়ে ৫০-৮০ ভাগ রোগীর লাল ফুসকুড়ি বা র‍্যাশ দেখা দেয়। কারো কারো মুখ ও নাকের মিউকাস মেমব্রেন থেকে অল্প রক্তপাতও হতে পারে।

কিছু লোকের ক্ষেত্রে রোগটি চরম পর্যায়ে পৌছে যায়। এক্ষেত্রে তীব্র জ্বর হয় এবং ১ থেকে ২ দিন স্থায়ী হয়। দেহের তরলের পরিমাণ কমে যায় এবং গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রক্ত সরবরাহ হ্রাস পায়। এই পর্যায়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকলতা ও প্রবল রক্তপাত হয়। রক্তপাত পরিপাকতন্ত্রেই বেশি হয়ে থাকে।

ডেঙ্গু রোগের শতকরা ৫ ভাগেরও কম ক্ষেত্রে শক (ডেঙ্গু শক সিনড্রোম) এবং হেমোরেজ (ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভার) ঘটে। উল্লেখ্য যে, যাদের আগেই ডেঙ্গু ভাইরাসের অন্যান্য সেরোটাইপের সংক্রমণ ঘটেছে (সেকেন্ডারি ইনফেকশন) তারা বর্ধিত বিপদের মধ্যে রয়েছে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে, যেমন ফুসফুস ও পর্দার মধ্যে (প্লুরাল ইফিউশন) কিংবা পেটে সামান্য পরিমাণ পানি জমতে পারে। কিন্তু বেশি প্লাজমা লিকেজ হলে রক্তচাপ কমে যায় ও রোগী শকে চলে যায়। বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ কমে যেতে পারে ও মাল্টি অর্গান ফেইলিউর হতে পারে। ডেঙ্গু শক সিনড্রোমে তাই শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা, শ্বাসের গতি বেড়ে যাওয়া এমনকি ফুসফুসে রক্তক্ষরণও হতে পারে।

রোগ নির্ণয়ঃ ডেঙ্গুজ্বরের লক্ষণ থাকুক বা না থাকুক যে পরীক্ষাগুলো অবশ্যই করতে হবে সেগুলো হল-

- ❑ জ্বর আসার প্রথম দিনেই যে টেস্টটি করে ডেঙ্গু সনাক্ত করা যায় সেটি হল NS1 এন্টিজেন টেস্ট।
- ❑ ডেঙ্গুজ্বরের বিরুদ্ধে শরীরের এন্টিবডি তৈরি করতে ৫ বা তার বেশি দিন সময় লাগে। সেই সময় পর এন্টিডেঙ্গু এন্টিবডি (IgG, IgM) টেস্ট করা যায়।
- ❑ রক্তের CBC টেস্ট করতে হবে। কারণ ডেঙ্গুজ্বরে Platelet Count দ্রুত কমে যেতে পারে এবং ডেঙ্গুর মারাত্মক লক্ষণের অন্যতম কারণই হল Platelet Count কমে যাওয়া।
- ❑ ডেঙ্গু ভাইরাস লিভার কোষকে সরাসরি আক্রমন করতে পারে এবং মৃদু হেপাটাইটিস করতে পারে। তাই লিভার এনজাইম টেস্ট করলে ALT বেশি পাওয়া যেতে পারে।

চিকিৎসা

ডেঙ্গুজ্বর একটি ভাইরাসজনিত রোগ বিধায় এর নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। তবে রোগমুক্ত হওয়ার জন্য যে কাজগুলো করতে হবে সেগুলো হল-

- ❑ পরিপূর্ণ বিশ্রাম
- ❑ জ্বরের জন্য শুধু মাত্র প্যারাসিটামল ও শরীর কিছুক্ষণ পর পর মুছে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে জ্বর বা ব্যথানাশক হিসেবে কোনোভাবেই এসপিরিন জাতীয় ওষুধ দেয়া যাবেনা।
- ❑ জ্বরের কারণে রোগীর ডিহাইড্রেশন থাকে, তাই প্রচুর তরল খাবার দিতে হবে। রোগী অচেতন হয়ে গেলে অনতিবিলম্বে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে।

সাম্প্রতিক ডেঙ্গু জ্বর প্রতিকারের ৬ টি উপায়

১. **জ্বর হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবেঃ** জ্বরেও ডেঙ্গু দেখা দিচ্ছে তাই জ্বর হলেই অবহেলা না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত। অন্তত ডেঙ্গু আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে।

২. **ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ সেবন করাঃ** জ্বর হলেই শুধুমাত্র প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খাওয়া যাবে। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনো ব্যথা নাশক ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

৩. **খাবারের বিষয়েও ডাক্তারের পরামর্শ নেয়াঃ** জ্বর হলে কী ধরনের খাবার খেতে হবে সে বিষয়ে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।

৪. **তরল খাবার গ্রহণ করাঃ** ডেঙ্গু জ্বরে শরীর থেকে প্রচুর পরিমানে ফ্লুইড কমে যায়। তাই জ্বর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর তরল খাবার, যেমন- পানি, শরবত, ডাবের পানি ইত্যাদি গ্রহণ করতে হবে।

৫. **জ্বর- পরবর্তী সময়ে সচেতন থাকাঃ** জ্বর- পরবর্তী সময়ে প্লাটিলেট কমে যাওয়া ও রক্তক্ষরণসহ নানা জটিলতা হতে পারে। এই সময়ে সচেতন থাকতে হবে ও চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

৬. **ডেঙ্গু নিয়ে আতঙ্কিত না হওয়াঃ** সাধারণ জ্বর এমনকি ডেঙ্গু জ্বর শনাক্ত হলেও আতঙ্কিত হওয়া যাবে না। যথাসময়ে চিকিৎসা নিলে ডেঙ্গু পুরোপুরি সেরে যায়।

সচেতনতা

- ❑ বাড়ীর আশপাশ, ঝোপঝাড়, জঙ্গল, জলাশয় পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- ❑ এডিস মশা স্বচ্ছ পানিতে ডিম পাড়ে। তাই অব্যবহৃত কৌটা, ডাবের খোসা, পরিত্যক্ত টায়ারের জমে থাকা পানি ৩ দিনের মধ্যে অপসারণ করতে হবে।
- ❑ গাছের টব, ফ্রিজ বা এসির নিচে ৩ দিনের বেশি জমা পানি রাখা যাবে না।
- ❑ বাড়ির কোথাও এমনকি বাথরুমেরও জমানো পানি ৩ দিনের বেশি রাখা উচিত নয়।
- ❑ এডিস মশা সাধারণত সকালে কামড়ায় কিন্তু অন্য সময়েও এ মশা কামড়াবে না তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না। তাই হাত পা ঢেকে কাপড় পরিধান করতে হবে এবং প্রয়োজনে লম্বা মোজা পরতে হবে।
- ❑ বাড়ির দরজা- জানালায় নেট লাগানো যেতে পারে।
- ❑ দিনে ও রাতে মশারি ব্যবহার করা উচিত এবং প্রয়োজনে কয়েল/স্প্রে ব্যবহার করতে হবে।
- ❑ বাচ্চাদের হাফ প্যান্টের পরিবর্তে ফুল প্যান্ট পরিয়ে স্কুলে পাঠাতে হবে।
- ❑ এ জ্বর সংক্রামক নয়, কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তিকে মশা কামড়ালে, ঐ মশার মাধ্যমে অন্যরা আক্রান্ত হতে পারে। তাই আক্রান্ত ব্যক্তিকে মশারির ভিতর রাখতে হবে।
- ❑ শরীরে মসকুইটো রিপেলেন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

কিডনীরোগ ও জটিলতা

মানব দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সমূহের মধ্যে কিডনী বা বৃক্ক অন্যতম। মানব দেহের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানগুলোর শোষণের পর বর্জ্য পদার্থ সমূহ রেচন প্রক্রিয়ার দ্বারা দেহ হতে অপসারণ করাই কিডনীর প্রধান কাজ। একজন সুস্থ মানুষের শরীরে সাধারণত দুইটি সচল কিডনী থাকে।

কিডনীর কার্যক্রম

১. মূত্র তৈরির মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ সমূহ রেচন প্রক্রিয়ায় দেহ হতে অপসারন করা।
২. শরীরে পানি, খনিজ লবণ ও অম্ল- ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করা।
৩. প্রয়োজনীয় হরমোন- রেনিন ও ইরাইথ্রপয়েটিন তৈরি করে দেহে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. নিষ্ক্রিয় ভিটামিন D- 2 কে সক্রিয় ভিটামিন D- 3 তে পরিনত করে।
৫. অনেক প্রয়োজনীয় ওষুধের মেটাবলিসম ও নিষ্কাশন করে কিডনী।

প্রচলিত কিডনীরোগ সমূহ

ক. জন্মগত ত্রুটি- ১) একটি মাত্র সচল কিডনী
২) পেলভিক কিডনী
৩) অশ্বক্ষুরাকৃতি কিডনী
৪) পলিসিস্টিক (polycystic) কিডনী

খ. গ্লমেরুলার ডিজিজেস- ১) নেফ্রটিক সিন্ড্রোম
২) গ্লমেরুলার নেফ্রাইটিস

গ. কিডনী পাথর (রেনাল স্টোন)

ঘ. কিডনী টিউমার- রেনাল ফাইব্রমা, উইল্ম'স টিউমার, রেনাল সেল কার্সিনোমা

ঙ. কিডনী প্রদাহ- পাইলো নেফ্রাইটিস, হাইড্রনেফ্রসিস

চ. রেনাল টিউবারকুলোসিস (যক্ষ্মা)

ছ. কিডনী ফেইলিউর- কিডনী ইঞ্জুরি, ক্রনিক কিডনী ডিজিজেস/ক্রনিক কিডনী ফেইলিউর

কিডনী রোগের ব্যাপকতাঃ বিশ্ব ও বাংলাদেশ- কিডনী রোগের জটিলতা স্বরূপ প্রতি বছর সারা পৃথিবীতে প্রায় ১.২ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। এর বেশির ভাগই আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক। বাংলাদেশের মোট পূর্ণ বয়স্ক জনগণের ১৭.৩% জটিল কিডনী রোগে আক্রান্ত। বাংলাদেশে প্রতি বছর ৩৫ হাজার এর এর বেশি রোগী কিডনী ফেইলিউর এ আক্রান্ত হয়। মানুষের প্রাণঘাতি অসুখের মধ্যে কিডনী রোগের অবস্থান ১১ তম।

ক্রনিক কিডনী ফেইলিউর এর কারণ সমূহ

১. ডায়াবেটিস
২. পুনঃ পুনঃ মূত্রনালির প্রদাহ
৩. গ্লমেরুলার ডিজিজেস
৪. উচ্চ রক্তচাপ
৫. পলিসিস্টিক কিডনী
৬. দীর্ঘদিন যাবত ব্যথানাশক ঔষধ সেবন

ক্রনিক কিডনী রোগের উপসর্গ

১. রাত্রিকালীন প্রস্রাব
২. ক্ষুধা মন্দা, ক্লান্তিভাব
৩. রক্ত স্বল্পতা, চুলকানি
৪. বমি বমি ভাব, ডায়রিয়া
৫. হাড় এর ব্যথা, নিদ্রাহিনতা
৬. ঘন ঘন প্রসাব হওয়া

ক্রনিক কিডনী রোগের লক্ষণ সমূহ

১. শরীরে হলদেটে ভাব
২. রক্ত শুন্যতা
৩. হাত-পায়ের নখে বাদামি দাগ
৪. শোথ (Oedema)
৫. উচ্চ রক্তচাপ
৬. গায়ে আঁচর/চুল্কানোর দাগ
৭. দেহে অন্য ইনফেকশন এর উপস্থিতি

চিকিৎসা

১. রোগের নির্দিষ্ট কারণ অনুসন্ধান এবং তার চিকিৎসা
২. কিডনী ড্যামেজ প্রতিরোধ-
ক) আমিষ জাতীয় খাবার কম খাওয়া
খ) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা (Target BP 130/85 mmHg)
৩. রক্ত শুন্যতার চিকিৎসা করা
৪. দেহে পানি ও খনিজ লবণ এর ভারসাম্য রাখা
৫. ইনফেকশন থাকলে- এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা
৬. রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপিঃ
ক) কিডনী ডায়ালাইসিস
খ) কিডনী ট্রান্সপ্লানটেশন

কিডনী রোগের জটিলতা

ক. গেঁটে বাত
খ. ইনসুলিন রেজিসটেন্স
গ. গ্যাস্ট্রিক আলসার, প্যানক্রিয়েটাইটিস
ঘ. কোষ্ঠকাঠিন্য, হাড় ক্ষয়
ঙ. রক্ত শুন্যতা, উচ্চ রক্তচাপ
চ. ভিটামিন- ডি এর অভাব
ছ. ত্বকের ইনফেকশন
জ. হাইপার লিপিডেমিয়া
ঝ. অস্টিও ডিসট্রফি

প্রতিরোধ

১. নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস
২. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা
৩. ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা
৪. নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যায়াম করতে হবে
৫. অতিরিক্ত আমিষ ও চর্বি জাতীয় খাবার পরিহার করতে হবে
৬. দৈহিক ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে
৭. মাত্রাতিরিক্ত ব্যথা নাশক ওষুধ সেবন করা যাবে না

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

মাথাব্যথা

মাথাব্যথা খুবই সাধারণ একটি সমস্যা। প্রত্যেক মানুষই জীবনের কোনো না কোনো সময় মাথাব্যথায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন। মথাব্যথা আসলে কোনো রোগ নয় বরং একটি উপসর্গ মাত্র। মাথাব্যথার অনেক রকমভেদ আছে যেমনঃ মাইগ্রেন, টেনশন-টাইপ মাথাব্যথা, ক্লাস্টার মাথাব্যথা ইত্যাদি। ঘনঘন মাথাব্যথা প্রাত্যহিক পারিবারিক ও কর্মজীবনকে বিষাদময় করে তুলতে পারে। এছাড়া তীব্র মাথাব্যথা ডিপ্রেশনের ঝুঁকি বাড়ায়।

মাথাব্যথার চিকিৎসা নির্ভর করে এর কারণের উপর তবে সবক্ষেত্রেই ব্যথানাশক ওষুধের ব্যবহার করা উচিত নয়।

জরিপে দেখা গেছে পৃথিবীতে কোনো একটি নির্দিষ্ট বছরে প্রায় অর্ধেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকেই মাথাব্যথায় ভুগে থাকে। এর মধ্যে টেনশন-টাইপ মাথাব্যথার রোগী সবচেয়ে বেশি প্রায় ১.৬ বিলিয়ন যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২১.৮%। এরপরেই মাইগ্রেনের অবস্থান। প্রায় ৮৪৮ মিলিয়ন (১১.৭%) ব্যক্তি মাইগ্রেনের সমস্যায় ভুগে থাকেন। পুরুষদের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা কম। মহিলাদের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা দেওয়ার গড়পড়তা সম্ভাবনা বেশি রয়েছে। শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গও হিস্প্যানিকদের মধ্যে এই লক্ষণ দেখা দেওয়ার গড়পড়তা সম্ভাবনা বেশি রয়েছে।

ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়

মাথাব্যথার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো হলো

- ধূমপান করা
- মদ্যপান করা
- পরিবারের কোনো সদস্যের যদি এই সমস্যা থাকে
- হরমোনগত পরিবর্তন
- দুশ্চিন্তা

কারণ

নানা কারণে মাথাব্যথা হতে পারে। এর নির্দিষ্ট কারণ নেই। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, প্রায় ৫০ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ মাথা ব্যথায় ভুগে থাকেন, যার মধ্যে টেনশন টাইপ মাথাব্যথার রোগী বেশি।

মাথাব্যথার সাধারণ কিছু কারণ হলো-

- ক্লান্তি
- পানিশূন্যতা
- পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব
- দুশ্চিন্তা ও অতিরিক্ত মানসিক চাপ
- অতিরিক্ত ব্যথানাশক ব্যবহার বা ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া
- সর্দি-কাশি
- মাথায় আঘাত, টিউমার
- ইনফেকশন
- দাঁতের রোগ
- খুব ঠাণ্ডা পানীয় বা খাবার দ্রুত খাওয়া
- অতিরিক্ত মদ্যপান, ধূমপান

বিভিন্ন রোগে মাথাব্যথা হতে পারে, যেমন

- অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস
- ফ্লু
- স্ট্রোক
- ব্রেইন ক্যান্সার
- হিমোফিলিয়া
- উচ্চ রক্তচাপ
- মৃগী রোগ
- সেরিব্রাল এডিমা
- মেনিনজাইটিস
- ক্রেনিয়াল নার্ভ পালসি
- প্রাইমারী ইনসমনিয়া
- ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমোরেজ
- বিনাইন প্যারোক্সিজমাল পজিশনাল ভার্টিগো
- ফ্র্যাকচার অফ দি স্কাল
- অ্যাকিউট স্ট্রেস রিঅ্যাকশন/ডিজঅর্ডার
- ক্রনিক পেইন ডিজঅর্ডার

ধরন ও চিকিৎসা

অনেক ধরনের মাথাব্যথা রয়েছে, যেমন মাইগ্রেন, টেনশন টইপ মাথাব্যাথা, ক্লাস্টার মাথাব্যথা ইত্যাদি। তবে রোগ নির্ণয়ের সুবিধার্থে মাথাব্যথাকে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি-এই দুই ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। মাইগ্রেন, টেনশনে মাথাব্যথা ইত্যাদি প্রাইমারি ক্যাটাগরিতে পড়ে। অন্যদিকে মাথায় আঘাত বা টিউমার, ইনফেকশন ইত্যাদি সেকেন্ডারি ক্যাটাগরিতে পড়ে।

টেনশন টাইপ মাথাব্যথা

বেশির ভাগ মাথাব্যথাই হয় টেনশন বা অতিরিক্ত দুশ্চিন্তার কারণে। টেনশন হলেই শরীরের অ্যাড্রিনাল গ্রন্থিগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, সেখান থেকে 'অ্যাড্রিনালিন' নামে বিশেষ এক ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরিত হয়। ফলে দেহকোষ থেকে হিস্টামিন, সেরাটোনিন ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য নিঃসৃত হয়। এতে মস্তিষ্কে অতিরিক্ত চাপ পড়ে এবং মাথাব্যথা অনুভূত হয়। অতিরিক্ত টেনশন থেকে হার্টের রোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদিও হতে পারে।

করণীয়

সুশৃঙ্খল পারিবারিক জীবনযাপন ও আনন্দময় ঝামেলাহীন জীবনই পারে টেনশন ও এর থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে।

মাইগ্রেন

'মাইগ্রেন' গ্রামাঞ্চলে যা সাধারণভাবে 'আধ কপালি ব্যথা' বলে পরিচিত। বস্তুত আজ থেকে পনের/বিশ বছর পূর্বে এই রোগের তেমন একটা প্রাদুর্ভাব ছিল না। কিন্তু সময়ের কালস্রোতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে সাথে এর ব্যাপকতাও ভীষণভাবে প্রসারিত হয়েছে।

মাইগ্রেনের কারণ

মাথাব্যথার প্রকৃত কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আজও কোনো স্থির সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি। বিজ্ঞানীরা ১৯৬০ সালে মাথাব্যথা সম্পর্কিত এক গবেষণায় জানান, টেনশনের কারণে অনেক সময় মাথাব্যথা হয় এবং তার চিকিৎসাও সহজ। রক্তবাহী শিরাগুলো যখন মস্তিষ্কে ঠিকমতো রক্ত সরবরাহ করে না, তখন সেটাকে অনেকে মাইগ্রেনের ব্যথা হিসেবে চিহ্নিত করেন। টেনশন বা অন্য কারণেও এটা হতে পারে। তাছাড়া রক্তবাহী শিরাগুলো কখনও কোনো কারণে অতিরিক্ত রক্ত সরবরাহ করলে মাথাব্যথা হতে পারে।

ধারণা করা হয়, টেনশন বা প্রাকৃতিক কারণ থেকে সৃষ্ট মাইগ্রেনের ব্যথার প্রারম্ভে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ কমে যায়- যার কিছুটা প্রভাব পড়ে অক্সিপিটাল এবং প্যারাইটাল নামক মস্তিষ্কের দুটি অংশের কার্যকারিতার উপর। ফলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মাথাব্যথার সৃষ্টি হতে শুরু করে। আবার যখন পুরোপুরিভাবে মাথাব্যথা শুরু হয়ে যায়, তখন বহিঃমস্তিষ্কের ধমনিগুলো প্রসারণ ঘটে- যা মূলত রক্তের মাঝে বিদ্যমান ৫-হাইড্রোক্সি ট্রিপটামিন (5-Hydroxy Tryptamine) নামক ব্রেনের উপাদানের উপস্থিতির পরিমাণের উপর নির্ভর করে।

প্রধান কারণ

ক. **বংশগত প্রভাব ঃ** অন্যান্য ব্যথার তুলনায় মাইগ্রেনের ব্যথার উপর বংশগত প্রভাব বেশি- যা মূলত কোষের একক 'জীন' -এর বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে।

খ. **টেনশন/দুশ্চিন্তা/অস্থিরতা ঃ** যারা সবসময় ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে চিন্তাগ্রস্ত থাকেন বা দুশ্চিন্তায় ভোগেন, তাদের মাঝে এর প্রকোপ বেশি। তাছাড়া হঠাৎ করে কোনো বিপদজনক খবর বা আবেগপ্রবণ অবস্থা এই মাইগ্রেনের জন্ম দেয়।

গ. **জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি এবং কিছু যৌন হরমোন ঃ** গবেষকদের মতে মাথাব্যথার সাথে নির্দিষ্ট কিছু যৌন হরমোনের সংযোগ রয়েছে। তবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা বেশি। যাদের নিয়মিত মাসিক হয় না তাদের এই মাইগ্রেনের হার বেশি। আবার অনেকের ক্ষেত্রে প্রত্যেক মাসিকের পূর্বাবস্থায় এই মাইগ্রেনের ব্যথা উঠতে পারে। অন্যদিকে যেসব মহিলা দীর্ঘদিন জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি সেবন করেন তাদের মাঝেও এই রোগের লক্ষণ বেশি দেখা যায়।

ঘ. **পরিবেশের প্রভাব ঃ** বর্তমানে আমাদের দেশসহ বিশ্বের বড় বড় শহরে ক্রমাগত জনসংখ্যার বৃদ্ধি পরিবেশকে অসহনীয় করে তুলছে। এরই মাঝে ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন কর্তৃক বর্জ্য পদার্থ ও ধোঁয়া পরিবেশকে এমন এক অবস্থায় এনেছে যার প্রভাব আমাদের শরীরের উপর পড়ছে। আর এমনি এক প্রভাবের কারণ হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে মাইগ্রেন। সম্প্রতি এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে, গ্রাম অঞ্চলের লোকদের চেয়ে শহর অঞ্চলের লোকদের মাঝে এর প্রভাব বেশি।

প্রভাবিত করে এমন কারণ

প্রথমত, কিছু কিছু খাবার রয়েছে যা গ্রহণের পর মাইগ্রেনের ব্যথার তীব্রতা বেড়ে যায় বা হালকা ব্যথার ভাব থাকলে তা পরিপূর্ণ মাইগ্রেনের ব্যথায় রূপ লাভ করে। তার মাঝে নিম্নলিখিত খাবার উল্লেখযোগ্য-

১. চকলেট

২. পনির

৩. মদ্যপান

৪. কোমল পানীয়

দ্বিতীয়ত, মাইগ্রেন রোগী কিন্তু পাশাপাশি সাইনাসসমূহের প্রদাহে ভুগছেন বা প্রচন্ড সর্দি কাশি বা ঠাণ্ডায় ভুগছেন; তাদের ক্ষেত্রে মাইগ্রেনের ব্যথার প্রকোপ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, যখন প্রচন্ড গরম পড়ে এবং পরিবেশের অবস্থা ভ্যাপসা আকার ধারণ করে, তখন মাইগ্রেনের রোগীর মাথাব্যথার প্রকোপ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে শীতকালে যদি ঠান্ডা বাতাস বেশি লাগে বা কুয়াশা পরিবেষ্টিত অবস্থা বিরাজ করে তখন এর প্রকোপ আরো বেড়ে যায়।

প্রকারভেদ

মাইগ্রেন সাধারণভাবে তিন প্রকার হয়। যথা-

ক. মাইগ্রেন উইথ অরা বা ক্লাসিক মাইগ্রেন;

খ. মাইগ্রেন উইথ আউট অরা বা কমন মাইগ্রেন;

গ. মাইগ্রেন ভ্যারিয়েন্স বা অ্যাটিপিক্যাল মাইগ্রেন।

মাইগ্রেনের লক্ষণ

অরা (Aura) বা প্রাক ইঙ্গিত মাইগ্রেন হচ্ছে মাইগ্রেন মাথাব্যথা শুরুর পূর্বের ত্রিশ মিনিটের মধ্যে কিছু বিশেষ অনুভূতির প্রমাণ। একটি মাইগ্রেন মাথাব্যথার আক্রমণকে কয়েক পর্যায়ে ভাগ করা যায়; (ক) প্রডরমাল (prodormal) বা প্রাকউপসর্গ যা মাথাব্যথা শুরু হওয়ার কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন পূর্বে লক্ষ্য করা যায়। (খ) অরা বা পূর্ব লক্ষণ যা মাথাব্যথা শুরুর পূর্ব মুহূর্তে হয়। (গ) মূল মাথাব্যথা, (ঘ) পরবর্তী উপসর্গ বা পোস্টডরমাল পর্যায়।

পূর্ব লক্ষণ

মাথাব্যথা শুরু হওয়ার কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন আগে শতকরা ৫০-৮০ ভাগ মাইগ্রেন রোগীদের ক্ষেত্রে কিছু মানসিক, স্নায়ুবিক, অটোনমিক ও অন্যান্য লক্ষণ দেখা যায়। এদের কেউ কেউ বিষন্ন, উল্লসিত, ঝিমুনি, অতি সচেতন, অতি উৎসাহী কিংবা খিটখিটে ইত্যাদি উপসর্গে ভুগে থাকেন। কারও মধ্যে বমি বমি ভাব, হাই ওঠা, ক্ষুধামন্দা, পিপাসা ইত্যাদি দেখা যায়। কখনও কখনও কিছু খাবার এর প্রতি আগ্রহ দেখা যায় যেগুলো সাধারণত খাওয়া হয় না।

পরবর্তী লক্ষণ

মাইগ্রেন মাথাব্যথার পরবর্তী পর্যায়ে রোগী সাধারণত ক্লান্ত এবং অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন যেন বিশাল একটা শারীরিক পরিশ্রমের ধকল গেছে। উপরন্ত এ সময়ে তিনি কোনো কিছু মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করতে পারেন না। বমি বমি ভাব, খাদ্যে অরুচি, শরীর ম্যাজ ম্যাজ করা ইত্যাদি

দু- একদিন পর্যন্ত থাকতে পারে। তবে এগুলো এত তীব্র হয় না বলে চিকিৎসাও দরকার পড়ে না।

অরা-বিহীন মাইগ্রেন বা কমন মাইগ্রেন

এটাকে কমন মাইগ্রেনও বলা হয়। অরাযুক্ত মাইগ্রেন এর চেয়ে এর প্রকোপ অনেক বেশি। এ মাথাব্যথা ৪- ৭২ ঘন্টাব্যাপী হয় এবং কমপক্ষে নিচের যে কোনো দুটি লক্ষণ থাকতে পারে।

ক. চিন চিন বা দপ দপ করে ব্যথা;

খ. অর্ধেক মাথায় ব্যথা;

গ. বমি বমি ভাব অথবা বমি হওয়া;

ঘ. আলো ভীতি বা শব্দ ভীতি;

অরা- যুক্ত মাইগ্রেন বা ক্লাসিক মাইগ্রেন

কমপক্ষে শতকরা পনেরো ভাগ মাইগ্রেন রোগী তাদের মাথাব্যথা শুরু হওয়ার আগে কিছু লক্ষণ অনুযায়ী আসন্ন মাথাব্যথার আক্রমণ বুঝতে পারে। সাধারণত এ রোগীরা মাথাব্যথা শুরুর পূর্বের আধাঘন্টা সময়ের মধ্যে চোখ আলোর ঝলকানি, চোখের সামনের কিছু অংশ অন্ধকার দেখা, রাস্তাঘাট উঁচু-নিচু, আঁকা-বাঁকা দেখা ইত্যাদি দেখতে পান। কোনো কোনো সময়ে রোগী শরীরের অংশ বিশেষ অনুভূতির অস্বাভাবিকতা অনুভব করেন। কারো কারো কিছুক্ষণের জন্য শরীরের অংশ বিশেষ অবশ, কথা বলার অস্বাভাবিকতাও হতে পারে।

চিকিৎসা

ক. সাধারণ চিকিৎসা

- যে সব খাবার মাইগ্রেনের ব্যথাকে ত্বরান্বিত করে সেসব খাবার পরিত্যাগ করা।
- যদি কোনো মহিলা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খেতে থাকেন, তবে তিনি বড়ি খাওয়া বন্ধ রাখবেন এবং অন্য যে কোনো প্রকার বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করবেন।
- পরিবেশগত কারণে যদি ধোঁয়া বা ধুলাবালি বা প্রচন্ড গরম বা শীতের বাতাসের মাঝে বের হতে হয় তবে মাস্ক বা রুমাল ব্যবহার করতে হবে।

খ. ক্ল্যাসিকেল মাইগ্রেনের চিকিৎসা

প্রথমত

- আরগোটামিন টারট্রেট (Ergotamine Tartrate) ০.৫-১.০ মিঃ গ্রাঃ জিহ্বার নিচে, পায়ুপথে বা ইনহেলার বা শ্বাসের সাথে নিতে হবে। মূলত এই চিকিৎসা তখনই দেয়া হয় যখন বেশি ব্যথার সাথে সাথে দৃষ্টিজনিত অসুবিধা বা স্নায়ুঘটিত সমস্যার লক্ষণ দেখা যায়। ট্যাবলেট আরগোটামিন নিজেই বমি বমি ভাব বা বমির উদ্রেক করে যার ফলে বেশিরভাগ রোগীই এটাকে সহ্য করতে পারেন না। অপরপক্ষে অতিরিক্ত সেবনের ফলে ধমনি/শিরাতে সংকুচিত ভাব প্রকাশ পায় ও পাশাপাশি মাথাব্যথাও শুরু হয়। যার ফলে এর ব্যবহার সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সপ্তাহে ১২ মিঃ গ্রাঃ এর মাত্রার বেশি মাত্রা না পড়ে। শুধু তাই নয়- নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ ঃ
  - গর্ভাবস্থায়
  - ইশকেমিক হার্ট ডিজিজ
  - প্রান্তীয় রক্তনালীর বিশৃঙ্খলতা (Peripheral artery disease)

দ্বিতীয়ত

- সহসা আক্রান্ত মাইগ্রেনে সুমাট্রিপট্যান (sumatriptan) যা ব্রেনের উপাদান সিরোটোনিন এর কাজের সহায়ক নতুন এক সংযোজিত ওষুধ।

ক্লাস্টার টাইপ মাথাব্যথা

দীর্ঘমেয়াদী মাথাব্যথার অন্যতম একটি কারন ক্লাস্টার মাথাব্যথা। এই মাথাব্যথা এপিসোডিক বা পালাক্রমে হয়। অর্থাৎ একবার হয়ে যাবার পর রোগী বেশ কিছুদিন ভাল থাকে। তারপর আবার মাথাব্যথা হয়। ক্লাস্টার মাথাব্যাথায় চোখ লাল হয়, চোখ দিয়ে পানি পড়ে, নাক বন্ধ থাকে বা নাক দিয়ে পানি পড়ে, অস্থির লাগে, বমিভাব হয় এবং ক্ষুধামন্দা থাকে। এ ধরনের মাথাব্যথা সাধারণত মাথার একদিকে হয়ে থাকে। ক্লাস্টার মাথাব্যথা ছেলেদের বেশী হয়। এর পেছনে কোন কারণ স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। পরিবারের কারো একজনের থাকলে অন্যদের হবার সম্ভাবনা থাকে। যাদের বয়স ২০ বা তার বেশী তার ক্ষেত্রে এ ধরণের মাথাব্যথার সম্ভাবনা বেশী। বিজ্ঞানীরা ক্লাস্টার মাথাব্যথার যথাযথ কারণ আজও বের করতে পারেনি। তবে সেরোটোনিন এবং হিস্টামিন নামের দুটি উপাদানের সাথে যে এই মাথাব্যথার সম্পর্ক আছে তা আজ প্রমাণিত। গবেষকরা হাইপোথ্যালামাসের সাথে এর সম্পর্ক পেয়েছেন। ক্লাস্টার মাথাব্যথা শুরু হবার কিছু 'ট্রিগার ফ্যাক্টর' আছে। যেমন- মদ্যপান ও ধূমপান, অতি উজ্জল আলো, উত্তাপ, কিছু ওষুধ, কোকেন, অত্যধিক পরিশ্রম, উঁচু স্থানে আরোহন।

করণীয়

মাইগ্রেনের চিকিৎসা এবং ক্লাস্টারের চিকিৎসা একই। চিকিৎসা হিসাবে উচ্চ মাত্রায় প্রদাহ বিনাশকারী (এন্টিইনফ্লামেটরী) দেয়া হয়। সুষম প্রোটিন ও ফলপ্রসূ। আর্গোটামিন (Ergotamine) ও ভেরাপামিল (Verapamil) রোগ প্রতিরোধের জন্য কার্যকর। অর্ধেকের বেশী রোগী ফেস মাস্কের মাধ্যমে ১০০% অক্সিজেন শ্বাসের সাথে নিয়ে উপকার পায়। এ ছাড়া অ্যালকোহল, ধূমপান ত্যাগ করা, সঠিক সময়ে ঘুমানোর অভ্যাস ইত্যাদি এসব সমস্যা থেকে মুক্ত রাখতে সহায়তা করে।

সাইনাস টাইপ মাথাব্যথা

সাইনাস টাইপ মাথাব্যথা এমন এক ধরনের মাথাব্যথা যা সাইনুসাইটিসের (sinusitis) সাথে দেখা দিতে পারে। সাইনুসাইটিসের কারণে সাইনাসের মেমব্রেন ফুলে ওঠে এবং সেখানে ইনফ্লামেশন সৃষ্টি হয়। এ কারণে চোখের চারপাশ, গাল ও কপালে চাপ অনুভূত হতে পারে।

কারণ

বিভিন্ন কারণে এই লক্ষণ দেখা যেতে পারে, যেমনঃ

- ❑ অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস
- ❑ ক্রনিক সাইনুসাইটিস
- ❑ হিমোফিলিয়া

- নাকের পলিপ
- আবহাওয়ার পরিবর্তনজনিত এ্যালার্জি
- অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন
- প্রাইমারী ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি

সংশ্লিষ্ট লক্ষণসমূহ

এই লক্ষণের সাথে অন্যান্য যে সকল লক্ষণ দেখা যেতে পারে সেগুলো হলোঃ

- নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া
- গলা ব্যথা
- কানের ব্যথা
- কাশির সাথে শ্লেষ্মা নির্গত হওয়া
- জ্বর
- কানে বদ্ধতা অনুভব করা

করণীয়

আগে কারণ নির্ণয় করতে হবে যে এটা সাইনাস কি না। এরপর চিকিৎসা দিতে হবে। তবে সাইনাসজনিত মাথা ব্যথায় অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ বেশ কাজ করে। এ ছাড়া গরম পানি দিয়ে গোসল করলে অথবা গামলায় গরম পানি নিয়ে নাক দিয়ে বাষ্প টেনে নিলে আরাম পাওয়া যায়। খুব বেশি মাথাব্যথা করলে এক টুকরো কাপড় গরম পানিতে ভিজিয়ে কপাল, চোখের ওপর বা নাকের দুই পাশে ছেঁক দিলে সাইনাসের বদ্ধতা কাটার পাশাপাশী আরাম পাওয়া যায়।

হরমোনাল মাথাব্যথা

নারীদের ঋতুকাল, গর্ভধারণ এবং মেনোপজের সময় হরমোনের মাত্রার পরিবর্তন হয়। তখন মন-মেজাজ পরিবর্তন, এমনকি মাথাব্যথাও হতে পারে। জন্মনিয়ন্ত্রণের ট্যাবলেট সেবনের পর হরমোনের পরিবর্তনগুলোর কারণেও অনেকের মাথাব্যথা বেড়ে যায়।

করণীয়

এর চিকিৎসায় হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি উপকারী ফল বয়ে আনতে পারে। এ সময় টেনশনমুক্ত দৈনন্দিন জীবন নিশ্চিত করা, পর্যাপ্ত ঘুম, পানি পান ইত্যাদি বেশ সহায়ক।

সেকেন্ডারি মাথাব্যথা

ব্যথার উৎস যখন মাথার বাইরে থাকে, তখন তাকে সেকেন্ডারি মাথাব্যথা বলে। যেমন- গ্লুকোমা, দাঁতের সমস্যা, আঘাত, মস্তিষ্কের টিউমার, ব্রেনের রক্তনালিতে ইনফেকশন ইত্যাদি।

করণীয়

এ ধরনের মাথাব্যথার ক্ষেত্রে বিলম্ব না করে একজন স্নায়ু বা মেডিসিন বিশেষজ্ঞের পরামর্শে যেসব কারণে মাথাব্যথা হচ্ছে, তা শনাক্ত করে চিকিৎসা নেওয়া উচিত।

গর্ভাবস্থায় মাথাব্যথা

গর্ভকালীন সময়ে মাথাব্যথা হওয়া একটি সাধারণ লক্ষণ। তবে এ অবস্থায় ব্যথা কমানোর জন্য কোনো ওষুধ খাওয়ার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এছাড়াও মাথাব্যথার সমাধান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন রিল্যাক্সেশন টেকনিকের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। গর্ভাবস্থায় মাথাব্যথা উচ্চ রক্তচাপের একটি লক্ষণ হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় মাথা ব্যথার কারণ

১. গর্ভাবস্থায় মাথাব্যথার পরিমাণ বেড়ে যায়; বিশেষ করে শরীরের ভেতর হরমোনের মুক্ত চলাচলের কারণে এটি হয়ে থাকে। এসময় শরীরে রক্তের পরিমাণ এবং চলাচলের মাত্রাও বেড়ে যায়। এটাও আর একটি কারণ হতে পারে।

২. আগে ক্যাফেইন নিতেন এমন মহিলা যদি হঠাৎ করে ক্যাফেইন পান করা বন্ধ করে দেন তাহলে মাথাব্যথা হতে পারে।

৩. ঘুমের পরিমাণ কম হলে বা শরীর ক্লান্ত থাকলে।

৪. সাইনাস, অ্যালার্জি, চোখ টান টান করা, দুশ্চিন্তা, হতাশা, ক্ষুধা এবং ডিহাইড্রেশন হলেও মাথাব্যথা দেখা দিতে পারে।

গর্ভাবস্থায় মাথা ব্যথার সমাধান ও নিয়ন্ত্রণ

১. খাদ্যাভাসের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে কোন জাতীয় খাবার খেলে মাথাব্যথা হচ্ছে।

২. নিয়মিত স্বাস্থ্যচর্চা রাখতে হবে। হাঁটাহাঁটি বা হালকা অ্যারোবিক্স করলে মাথাব্যথার সমাধান করা সম্ভব।

৩. বিষন্নতা থেকে দূরে থাকতে হবে।

৪. সারাদিন অল্প অল্প করে অনেক বার খাবার খেতে হবে। একসাথে অনেক খাবার খাওয়া যাবে না।

৫. প্রচুর পরিমাণ পানি বা পনি জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে হবে।

৬. নিয়মিত এবং পরিমাণমত ঘুমাতে হবে।

পরামর্শ

ঘন ঘন মাথাব্যথা প্রাত্যহিক পারিবারিক ও কর্মজীবনকে বিষাদময় করে তুলতে পারে। তা ছাড়া তীব্র মাথাব্যথা ডিপ্রেশনের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই মাথাব্যথা হলে যথাযথ চিকিৎসা করানো উচিত। মাথাব্যথা বেশি হলে কেউ প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ খেতে পারেন। তবে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক নয়।

অতিরিক্ত ধূমপান, মদ্যপান, মাদক সেবন, চা-কফি, অনিয়মিত এবং অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ সেবন, রোদ বা অতিরিক্ত গরম আবহাওয়ায় বেশিক্ষণ থাকা, অতিরিক্ত শারীরিক, মানসিক পরিশ্রম, ক্ষুধার্ত থাকা ও সময়মতো না খাওয়া, যেকোনো ধরনের মানসিক চাপ ইত্যাদি মাথাব্যথার কারণ। তাই এসব ব্যাপারে সতর্ক থাকলে মাথাব্যথা বেশির ভাগ কমে আসবে। পাশাপাশি ইতিবাচক জীবনচর্চা, সুনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক বা মানসিক বিশ্রাম, পর্যাপ্ত ঘুম, মেডিটেশন ইত্যাদি মাথাব্যথার প্রকোপ কমাতে সাহায্য করে।

তথ্যসূত্র

- স্কয়ার

গর্ভাবস্থায় যখন প্রথম বারের মত শর্করা অসহিষ্ণুতা (Glucose in tolerance) পাওয়া যায়, তখন তাকে গর্ভাবস্থাজনিত ডায়াবেটিস বলে। গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস রোগ নির্নয় ও তার ব্যবস্থা নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ন কারন এর সাথে ভ্রুন তথা শিশু ও মায়ের অনেক ঝুকি জড়িত। ডায়াবেটিক মায়ের নবজাত শিশুর জন্মগত দৈহিক বিকৃতি প্রায় ২৭% এবং এর সর্বব্যপিতা স্বাভাবিক মায়েদের চাইতে ৫-৮ গুন বেশি। সুতরাং প্রতিটি গর্ভবতী মায়ের জন্য তা যথা সময়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া উচিৎ।

গর্ভবতী মায়েদের ডায়াবেটিস নির্ণয় করতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ অনুসরন করতে হবে।

১. প্লাজমার শর্করার পরিমাণ নির্ধারণ করা।

২. যে সকল মায়েদের আগে শর্করা অসহিষ্ণুতা ছিলনা তাদেরকে গর্ভবতী হবার ২৪-২৮ সপ্তাহ এর মধ্যে কোন পূর্বশর্ত ছাড়াই (যেমন- দিনের কোন নির্দিষ্ট অংশ বা খাবার আগে পরে ইত্যাদি)।

৩. ৫০ গ্রাম গ্লুকোজ শরবত খাওয়াতে হবে। ঠিক এক ঘন্টা পর রক্তে শর্করার প্রতিফলন দেখতে হবে।

৪. এক ঘন্টা পর রক্তের শর্করামান যদি ১৪০ মিঃ/গ্রাম/ডিঃএল (৭.৮ মিঃ মোল/লিঃ) বার তার বেশি হয় তাহলে রোগীকে রোগ নির্ণায়ক শর্করা সহ্য ক্ষমতা পরীক্ষা (GTT) করতে হবে।

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস রোগ নির্নয়

১. ৩ দিন স্বাভাবিক কাজকর্ম ও শর্করা (১৫০ গ্রাম শর্করা) খেয়ে আগের দিন রাত্রে ১০-১২ ঘন্টা উপোস করার পরদিন ভোরে ১০০ গ্রাম গ্লুকোজ শরবত পান করতে হবে।

২. গ্লুকোজ পান করার যথাক্রমে ১, ২ , ও ৩ ঘন্টা পর পর রক্তে শর্করার পরিমাণ পরিমাপ করতে হবে। এই সময় রোগী বসে থাকবে, কোন কিছু খাওয়া বা ধূমপান করা নিষেধ।

৩. দুই বা ততোধিক পরীক্ষায় রক্তরসে শর্করার মান যদি নিন্মলিখিত সীমা বরাবর থাকে বা অতিক্রম করে তখন তাহাকে গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

   ক) খালিপেটে ১০৫ মিঃ গ্রাম/ডিঃএল (৫.৮ মিঃ মোল/লিঃ)

   খ) গ্লুকোজ নেবার ১ ঘন্টা পর ১৯০ মিঃ গ্রাম/ডিঃএল (১০.৬ মিঃ মোল/লিঃ)

   গ) গ্লুকোজ নেবার ২ ঘন্টা পর ১৬৫ মিঃ গ্রাম/ডিঃএল (৯.২ মিঃ মোল/লিঃ)

   ঘ) গ্লুকোজ নেবার ৩ ঘন্টা পর ১৪৫ মিঃ গ্রাম/ডিঃএল (৮.১ মিঃ মোল/লিঃ)

গর্ভাবস্থায় শর্করা অসহিষ্ণুতার শ্রেনীবিন্যাস

এটি দুই ভাগে বিভক্ত-

১. গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস (GDM)

২. গর্ভ-পূর্বাবস্থায় ডায়াবেটিস বা অস্বাভাবিক শর্করা সহিষ্ণুতা (Pre-gestation diabetes/IGT)

১. গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস (GDM) ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে একে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

   ক) (GDM-A) খালিপেটে রক্তের শর্করার মান যদি ১০৫ মিঃ গ্রাম/ডিঃ এল বা তার বেশি হয় (৫.৮ মিঃ মোল/লিঃ)

   খ) (GDM-A_2) খালিপেটে রক্তের শর্করার মান যদি ১০৫ -১২৯ মিঃ গ্রাম/ডিঃ এল (৫.৮-৭.২ মিঃ মোল/লিঃ)

   গ) (GDM-B) ডায়াবেটিসের উপসর্গ সহ অথবা খালিপেটে রক্তের শর্করার মান যদি ≥১৩০ মিঃ গ্রাম/ডিঃ এল (≥৭.২ মিঃ মোল/লিঃ)

২. গর্ভ-পূর্বাবস্থায় ডায়াবেটিস বা অস্বাভাবিক শর্করা সহিষ্ণুতা "হোয়াইট" শ্রেণী বিভাগ (White Class) ঃ

   ক) গভ-পূর্বাবস্থায় GDM-B এবং শর্করা সহ্যগুণের ঘাটতি (IGT)

   খ) গর্ভ-পূর্বাবস্থায় GDM-B এবং ১০ বৎসরের কম ডায়াবেটিস রোগ আছে যা ধরা পড়েছে ≥২০ বয়সে।

   গ) গর্ভ-পূর্বাবস্থায় ডায়াবেটিস যা ১০-১৯ বৎসর যাবত আছে য ধরা পড়েছে ১০-১৯ বৎসরে বয়সে।

   ঘ) গর্ভ-পূর্বাবস্থায় ডায়াবেটিস রোগের বয়স ≥২০ বৎসর যা ১০ বছর বয়সের আগে ধরা পড়েছে এবং চোখের জটিলতা হয়েছে।

   ঙ) গর্ভ-পূর্বাবস্থায় ডায়াবেটিস + কিডনীর জটিলতা

   চ) গর্ভ-পূর্বাবস্থায় ডায়াবেটিস + চোখের জটিলতা

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসা

ডায়াবেটিক মায়েদের গর্ভাবস্থায় কাঙ্খিত ফল পেতে হলে গর্ভধারন-পূর্ববস্থা হতে সন্তান প্রসব পর্যন্ত রোগীকে যথাযথভাবে অনুসরন করতে হবে। এই সকল রোগীকে সফলভাবে চিকিৎসা করতে হবে "দলগত পরিচর্যাধীন" (Team care) রাখতে হয়। আদর্শগতভাবে দলের ভিতর ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ও শিশু বিশেষজ্ঞ বিশেষ করে নবজাত শিশু পারদর্শী হলে ভাল হয়। এ ব্যাপারে প্রাথমিক দায়িত্ব থাকবে ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞের উপর যিনি অনাগত মাকে ডায়াবেটিসের প্রভাব সম্বন্ধে সতর্ক ও সচেতন করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ছাড়াও মা ও শিশুর সম্ভব যে সকল জটিলতা হতে পারে তা বুঝিয়ে দেবেন এবং তা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা নিবেন।

বহির্বিভাগের "গর্ভবতী ক্লিনিকে" প্রতি সাক্ষাতকারে রোগীকে সতর্কতার সাথে ডায়াবেটিস ও ধাত্রীবিদ্যা বিশেষজ্ঞরা দেখে প্রয়োজনীয় উপদেশ দেবেন। এই সময় বিপাকের যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, ভ্রুনের স্বাভাবিক বিকাশ ও ভ্রুনের বর্তমান অবস্থা দেখতে হবে। গর্ভাবস্থায় শেষের দিকে অন্যান্যদের সাথে শিশু বিশেষজ্ঞ ও যোগ দেবেন এবং বাচ্চা প্রসব হওয়া পর্যন্ত নিরীক্ষন ও অনুসরণ করবে।

গর্ভ-পূর্ব ডায়াবেটিস বা অস্বাভাবিক শর্করা সহিষ্ণুতা

যে সকল রোগী গর্ভধারন করার পূর্বেই ডায়াবেটিস বা অস্বাভাবিক শর্করা সহিষ্ণুতায় ভুগছে তাদেরকে বিশেষভাবে অনুসরন করতে হবে। ১৯৮০ সালের দিকের বিভিন্ন ডায়াবেটিস কেন্দ্রের ফলাফলের বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে স্বাভাবিক মায়েদের চাইতে ডায়াবেটিক মায়েদের শিশুদের জন্মগত দৈহিক বিকৃত প্রায় ৩-৬ গুন বেশি। গর্ভবস্থায় প্রথম তিনমাসে যখন বিভিন্ন অংগ প্রত্যঙ্গের গোড়া পত্তন বা সৃষ্টি হয় তখনই মায়ের

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না রাখার ফলে শিশুর দৈহিক বিকৃতি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ মা তার গর্ভাবস্থা জানার পূর্বে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার আগেই তার ভ্রুনের দৈহিক বিকৃতি (Malformation) ঘটে যায়। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ হতে ইহা স্পষ্ট যে ভ্রুন ও তার বিভিন্ন অংগ গঠন (Organogenesis) এর সময় ডায়াবেটিস অবশ্যই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হবে। এই উদ্দেশ্যে ৩ টি জিনিস মনে রাখতে হবে।

- অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসে গর্ভবতী মা ও তার শিশুর যে সকল জটিলতা হতে পারে তা সম্বন্ধে রোগীকে সম্পূর্ণ ধারনা দেওয়া।
- মায়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হওয়া এবং সমস্যা থাকলে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।
- সম্ভব দৈহিক বিকৃতি ও ডায়াবেটিস জনিত গর্ভপাত রোধ করা।

গর্ভাবস্থা পরবর্তী ব্যবস্থা

যে সকল গর্ভবতী মায়ের গর্ভ-পূর্বাবস্থায় ডায়াবেটিস সন্তোষজনক ভাবে নিয়ন্ত্রেণে ছিল তাদের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন নাই। তবে সম্পুর্ণ নতুন নির্নয় করা ইন্সুলিন নির্ভরশীল রোগীকে অবশ্যই ৩-৬ দিনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি করে তার শারিরীক অবস্থার মূল্যায়ন, ডায়াবেটিস ও গর্ভসংক্রান্ত জটিলতা সম্বন্ধে ধারনা দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা শুরু করা আবশ্যক। এর পরবর্তী ব্যবস্থা হল বহির্বিভাগের রোগী হিসাবে তাকে নিয়মিতভাবে অনুসরন করা। ৭-১৪ সপ্তাহের মধ্যের Ultrasonogram এর মাধ্যমে ভ্রুনের আকার, আয়তন বা বৃদ্ধি দেখে সম্ভব ভ্রুনবিপত্তির ব্যাপারে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

পরবর্তী সাক্ষাৎকার

গর্ভাবস্থার ১ম ও ২য় ত্রৈমাসিক (Trimester) দিনগুলিতে প্রতি দুই সপ্তাহ পর পর ডায়াবেটিস ধাত্রী ক্লিনিকের পরামর্শ নিতে হবে। দুই সাক্ষাতের মাঝামঝি কোনো সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে বা টেলিফোনে বিশেষ নার্স বা পারদর্শী লোকের পরামর্শ নেবার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

গর্ভাবস্থায় ৩য় ট্রাইমেস্টারে যেহেতু ভ্রুণের উপর অতিরিক্ত ঝুকিও চাপ পড়ে সে জন্য তখন যুক্তভাবে মেডিক্যাল ও ধাত্রী বিষয়ক নিরীক্ষন দরকার। সেই উদ্দেশ্য গর্ভের ৩০ তম সপ্তাহ থেকে প্রতি সপ্তাহেই রোগীকে দেখতে হবে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

এটিকে আমরা দুই ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

ক. প্রয়োজনীয় খাবারের সমন্বয় সাধন করে।

খ. ইনসুলিন ইনজেকশন দিয়ে।

ক. খাবার সমন্বয় কিভাবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে ঃ গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের জন্য পথ্য ব্যবস্থায় সাধারন ডায়াবেটিস রোগীদের সাথে মূল কোন পার্থক্য নেই। শর্করার পরিমাণ দৈনিক ২০০ গ্রাম এর কম করা উচিৎ নয়। আমিষের ভাগ বাড়াতে হয়ে কেননা তা ভ্রুণ তথা অনাগত শিশুর পুষ্টি ও শরীর গঠনে সাহায্য করে। আমিষের দিনপ্রতি পরিমাণ রোগীর আদর্শ ওজনের (Ideal body wt) ১.৫-২.০ গ্রাম/কেজি হিসাবে দিতে হবে। আমেরিকায় জাতীয় গবেষণা পরিষদের মাতৃপুষ্টি পাউন্ড (১২.৬ কেজি) এর বেশী হওয়া উচিৎ নয়।

খ. ইনসুলিন চিকিৎসা ঃ গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস রোগীকে শর্করা কমানোর জন্য কোন রকম খাবার ওষুধ যেমন- সালফোনিলইউরিয়া দেওয়া উচিৎ নয়। গর্ভবতী ডায়াবেটিস মায়ের একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে ইনসুলিন। এই ইনসুলিনের মধ্যে Purified monocomponent insulin হল আদর্শ ইনসুলিন। রেগুলার ইনসুলিন দিনে ৩ বার খাবার আগে দেওয়া হয়।

গর্ভাবস্থায় আদর্শ শর্করার পরিমাণ

গর্ভাবস্থায় রোগীকে এমনভাবে রোগীকে চিকিৎসা করতে হবে যেন, শর্করার পরিমাণ নিম্নলিখিত পরিসরের মধ্যে থাকে।

- খালিপেটে শর্করার পরিমাণ ৬৫-৮৫ মিঃ গ্রাম/ডি.এল (৩.৬-৪.৭ মিঃ মোল/লিঃ)
- খাবার এক ঘন্টা পর শর্করার পরিমাণ ১৪০-১৫০ মিঃ গ্রাম/ডি.এল (.৭-৮.৩ মিঃ মোল/লিঃ)
- খাবার দুই ঘন্টা পর শর্করার পরিমাণ ১২০-১৩০ মিঃ গ্রাম /ডি.এল (৬.৭-৭.২ মিঃ মোল/লিঃ)

প্রতিদিন দৈনিক চাহিদার মোট ইনসুলিনকে প্রয়োজন অনুসারে ৩ মাত্রায় ভাগ করে দিতে হয়।

খাবার ওষুধ- সালফোনিলিউরিয়া দৈহিক বিকৃতি (Teralogenic effect) ঘটায়। অন্তঃসত্ত্বা ডায়াবেটিস মাকে খাবার ওষুধ নিয়ে চিকিৎসা করলে নিম্নলিখিত উপায়ে ভ্রুণের দৈহিক বিকৃতি ঘটতে পারে।

- হাইপোগ্লাইসিমিয়া (রক্তে অস্বাভাবিক শর্করা স্বল্পতা)
- অস্বাভাবিক উচ্চ- ইনসুলিন (Hyperinsulinemia) এর জন্য
- জেনিটিক সমস্যা (Genetic impairment)

অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস আসন্ন মা ও তার শিশুকে কি কি ক্ষতি করে

ক. মায়ের নিম্নলিখিত বিপদ জনক অসুবিধা হতে পারে-

১. গর্ভাবস্থাজনিত উচ্চ-রক্তচাপ
২. অতিরিক্ত এমনিওটিক জল
৩. অতিরিক্ত বিপাকজনিত সমস্যা
৪. ডায়াবেটিস সম্পৃক্ত অতিরিক্ত জটিলতা যেমন চোখের ও কিডনীর জটিলতা।

খ. শিশুর উপর ঝুঁকিসমূহ

১. গর্ভপাত
২. জন্মগত দৈহিক বিকৃতি
৩. ভ্রুণের ক্লেশময় অবস্থা
৪. নবজাত শিশুর শ্বাসকষ্ট
৫. মায়ের গর্ভে ভ্রুণের মৃত্যু
৬. নবজাত শিশুর হাইপোগ্লাইসিমিয়া (রক্তে অস্বাভাবিক শর্করা স্বল্পতা)
৭. নবজাত শিশুর জন্ডিস

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

গর্ভাশয়ের সারভিক্সের (cervix) কোষ থেকে উৎপন্ন ক্ষতিকারক টিউমারকে সারভাইকাল বা জরায়ু ক্যান্সার বলে। বর্তমানে সারা বিশ্বের নারীদের কাছে জরায়ু ক্যান্সার একটি আতঙ্কের নাম। এই রোগের প্রকোপ দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। কারণ, প্রতি বছর গোটা পৃথিবীতে প্রায় ২,৫০,০০০ নারী জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

অনেকেই মনে করেন যে, জরায়ু ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা চল্লিশোর্ধ্ব নারীদের বেশি থাকে। কিন্তু এটি ভুল ধারণা। যে কোন বয়সেই নারীদের জরায়ু ক্যান্সার হতে পারে। তবে বিশেষ করে ৪০ বছর বয়স্ক বা এর চেয়েও বেশি বয়সের মহিলাদের জরায়ু ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকেন।

যোনিতে রক্তপাত হওয়া এই রোগের প্রধান লক্ষণ। তবে কিছু আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্যান্সার চূড়ান্ত পর্যায়ে না গেলে কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষণ দেখা দেয় না। প্রাথমিক অবস্থায় সারভাইকাল ক্যান্সারের চিকিৎসা সার্জারির মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। তবে ক্যান্সার তীব্র আকার ধারণ করলে কোমোথেরাপি অথাবা রেডিওথেরাপির মাধ্যমে তার চিকিৎসা করা হয়। জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ত নারীদের প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা না করানোর ফলে তাদের বেঁচে থাকার হার ৫০% কমে যায়। আর যারা প্রথম থেকেই চিকিৎসা করান, তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ৯৫%। বার বার সন্তানসম্ভবা হওয়া, অনিয়ন্ত্রিত যৌন জীবন বা জরায়ুর যে কোনো সংক্রমণ থেকে এর শিকার হতে পারেন মেয়েরা। স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব, যৌনাঙ্গের অপরিছন্ন অবস্থাও এর জন্য দায়ী।

কারণ

স্বাভাবিক/সুস্থ কোষের জিনগত পরিবর্তন হওয়ার (মিউটেশন, mutation) কারণে তা অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করলে জরায়ুর ক্যান্সারের সূত্রপাত হয়। স্বাভাবিক কোষ একটি নির্দিষ্ট হারে বর্ধিত হয় এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করে। এই কোষের বিনাশ/মৃত্যুও একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘটে। কিন্তু ক্যান্সার কোষের বিকাশ ও সংখ্যাবৃদ্ধি হয় অনিয়ন্ত্রিতভাবে এবং এই কোষ ধ্বংস হয় না। অস্বাভাবিক এই কোষগুলি সঞ্চিত হয়ে টিউমারের সৃষ্টি করে থাকে। ক্যান্সার কোষগুলি আশেপাশের টিস্যুকে আক্রান্ত করে,

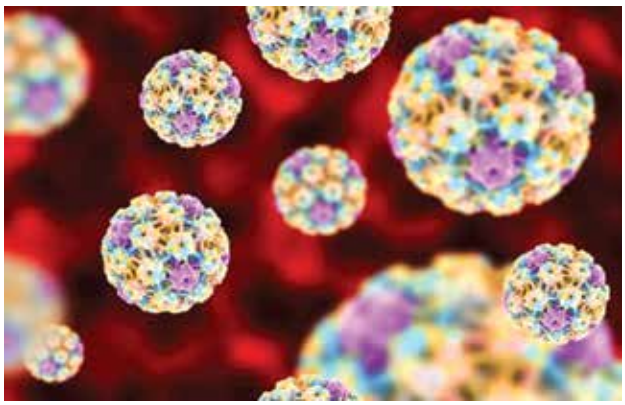

এইচ পি ভি

এমনকি টিউমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শরীরের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। জরায়ুর ক্যান্সারের মূল কারণ সম্বন্ধে এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি, তবে রোগটি সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) [Human Papilloma Virus (HPV)] এর একটি ভূমিকা আছে। এই ভাইরাসের অনেকগুলো প্রজাতি রয়েছে যার অধিকাংশই জরায়ুমুখ ক্যান্সারের কারণ নয়। শুধু মাত্র অল্প কিছু প্রজাতি জরায়ুমুখ ক্যান্সারের জন্যে দায়ী। কিছু কিছু ভাইরাস যৌনাঙ্গে ওয়ার্ট বা ছোট ছোট আচিলের মত থাকে যার বেশিরভাগ কোন ইনফেকশনই করে না।

২০১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১০০ ধরনের এইচপিভি ভাইরাস সনাক্ত হয়েছে। অবশ্য এর বেশিরভাগই জরায়ু ক্যান্সারের জন্য অতটা ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তবে এইচপিভি-১৬, এইচপিভি ১৮, এইচপিভি-৬, এইচপিভি-১১ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, এই ক্যান্সারের লক্ষণ প্রকাশের প্রায় ২ থেকে ২০ বছর আগেই একজন নারী এই ভাইরাস বা এই জাতীয় অন্য ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হন। জরায়ুর কোষগুলোতে ভাইরাসে আক্রান্ত হলে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেয়, একে বলে ডিসপ্লাশিয়া। স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত এ সব কোষগুলি পরে ক্যান্সার কোষে পরিণত হয়। মজার বিষয় হল, পরিবর্তিত কোষগুলি ক্যান্সার কোষে পরিবর্তিত হতে অনেক সময় লেগে যায়। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় নূন্যতম ৮ বছর সময় লাগে। কোন কোন ক্ষেত্রে ১৫-২০ বছরও সময় লাগতে পারে।

যারা ঝুঁকির মধ্যে আছে

অনেকেই মনে করেন যে এই অসুখটি হয়তো প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরে হয়ে থাকে কিন্তু এটি ভুল ধারণা। যেকোন বয়সেই নারীদের জরায়ু ক্যান্সার হতে পারে। জরায়ুমুখ ক্যান্সার ১৫-৪৫ বছর বয়সের নারীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়, কিন্তু ক্যান্সারের লক্ষণ প্রকাশের প্রায় ২ থেকে ২০ বছর আগেই একজন নারী এ রোগের ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হন।

তবে বিশেষ করে ৫০ বছর বয়স্ক কিংবা এর থেকেও বেশি বয়সের নারীরা জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে থাকেন বেশি। তবে সচেতনতার মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধ করা যায়। তবে গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে শিল্পোন্নত দেশের নারীরা জরায়ু ক্যান্সারে অধিক আক্রান্ত হয়ে থাকেন এবং অন্য দিকে আফ্রিকান, আমেরিকান ও এশিয়া মহাদেশের নারীদের এই ক্ষেত্রে জরায়ু ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি অনেক কম সাদা চামড়ার নারীদের থেকে।

লক্ষণ

এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সাধারণত নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা যায়ঃ

পেলভিসে বা শ্রেণীচক্রে ব্যথা হওয়া (Pelvic pain)	যোনী দিয়ে স্রাব নির্গত হওয়া (Vaginal discharge)
মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ (Heavy menstrual flow)	অপ্রত্যাশিত মাসিক (Unpredictable menstruation)
যোনী পথে চুলকানি (Vaginal itching)	মাসিক ব্যতীত রক্তক্ষরণ (Intermenstrual Bleeding)
মাসিকের সময় ব্যথা হওয়া (Painful menstruation)	যোনিদ্বারে জ্বালাপোড়া (Vulvar irritation)
জন্ডিস (Jaundice)	যোনিদ্বারে পিণ্ড/চাকা (Mass on vulva)
পেট ফুলে যাওয়া (Swollen abdomen)	

জরায়ু ক্যান্সারকে 'সাইলেন্ট কিলার' বলা হয়ে থাকে। কারণ এই অসুখ দেখা দিলে অনেক নারীরাই এর প্রাথমিক লক্ষণগুলো বুঝতে পারেন না বা লক্ষণ দেখা দিলেও বিশেষ গুরুত্ব দেন না। সচেতন হওয়ার আগেই মৃত্যু এসে কড়া নাড়াতে থাকে দুয়ারে। কিন্তু একদিনে বা একমাসে হঠাৎ করে এ ক্যান্সার হয় না। আক্রান্ত হওয়ার সময় থেকে শুরু করে শেষ পর্যায়ে পৌঁছাতে ১৫ থেকে ২০ বছর সময় লাগতে পারে।

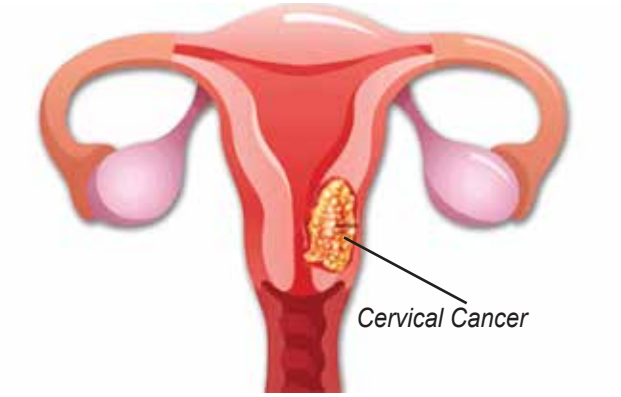

প্রাথমিক স্তরে এই ক্যান্সার রুখে দেওয়ার অন্যতম পদক্ষেপ এ রোগের উপসর্গগুলিকে চেনা। যত দ্রুত এই ধরনের ক্যান্সারের চিকিৎসা শুরু করা যাবে, প্রাণ বাঁচানোর সম্ভাবনা ততই বাড়বে। আশার কথা, জরায়ুর ক্যান্সারই একমাত্র ক্যান্সার যার টিকা রয়েছে এবং প্রাথমিক অবস্থায় রোগ নির্ণয় করা গেলে তা সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব।

মোনোপজ এসে যাওয়ার পরেও যদি হঠাৎ কোনো কারণে রক্তক্ষরণ শুরু হয়, তাহলে সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। সাধারণত, জরায়ুর গায়ে জন্মানো টিউমার ফেটে এই অকাল রক্তক্ষরণ শুরু হয়। আর এই টিউমারের ঘা থেকেই জন্ম নেয় ক্যান্সার।

যেসব নারীর মোনোপজ শুরু হয়নি জরায়ুর ক্যান্সারে আক্রান্ত হতে পারেন তারাও। সে ক্ষেত্রে পিরিয়ডের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও পেটে প্রচণ্ড ব্যথা থাকবে। এ ছাড়া জরায়ুর ক্যান্সারের আর একটি প্রাথমিক লক্ষণ হঠাৎই অতিরিক্ত পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত সাদা স্রাব শুরু হওয়া। এছাড়া পেটে ব্যথা, বমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, তলপেটে চাপ ধরে থাকা, ওজন হ্রাস ইত্যাদি উপসর্গ ধীরে ধীরে এই রোগের ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে।

রোগ নির্ণয়

- জরায়ুর মুখে ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের screening tests রয়েছে। যেমন- Pap smear ও VIA টেস্ট। জরায়ু মুখে লালা বা কোষ স্ক্র্যাপ করে নিয়ে স্ক্রিন করে দেখা হয় যে ওই টিস্যুগুলোর পরিবর্তন হয়েছে কিনা। পরিবর্তন হলে বুঝতে হবে এটা আরও ১০ বছর বা তার চাইতে বেশি সময় পর ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়বে। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা নিলে ক্যান্সার থেকে দূরে থাকতে পারবে। এর মধ্যে বাংলাদেশ VIA পরীক্ষাটকেই সর্বসাধারণের জন্য screening test হিসাবে নির্ধারণ করেছে। এর কারণ হচ্ছে VIA test অতি সহজেই ও স্বল্পমূল্যে করা সম্ভব। সকল সরকারী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল এবং মা শিশু স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরীক্ষাটি বিনামূল্যে করানোর সুযোগ রয়েছে।
- চিকিৎসকেরা এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের নিম্নলিখিত টেস্টগুলি করার পরামর্শ দিয়ে থাকেনঃ
  - কিডনী ফাংশন টেস্ট (Kidney function test)
  - লিভার ফাংশন টেস্ট (Liver function test)
  - সিবিসি (CBC-Complete Blood Count)
  - এইচপিভি ডিএনএ ডিটেকশন (HPV DNA detection)
  - প্যাপ'স স্মেয়ার ফর সাইটোলজি (Pap's smear for cytology)
  - বায়োপসি (Biopsy)
  - সিটি স্ক্যান অ্যাবডোমেন (CT scan abdomen)
  - ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং (এম.আর.আই) [Magnetic resonance imaging (MRI)]
  - এক্স-রে, চেস্ট পি-এ ভিউ (X-ray, Chest P/A view)

ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়

মূল কারণ না জানা গেলেও নিম্নোক্ত রিস্ক ফ্যাক্টরসমূহকে ক্যান্সারের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। যেমন-

- অল্প বয়সে বিয়ে হলে বা ১৬ বছরের আগে যৌনমিলন করে থাকলে
- ২০ বছরের নিচে গর্ভধারণ করে থাকলে
- অধিক ও ঘনঘন সন্তান প্রসব করলে
- নিম্ন আয়ের মানুষ হলে ও স্বাভাবিক জীবন যাপন বাধাগ্রস্ত হলে
- বহুগামিতা
- রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই কম থাকলে
- HIV দ্বারা সংক্রমণ হলে
- জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল দীর্ঘদিন খেলে
- ধূমপান করলে
- স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব এবং যৌনাঙ্গ অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকলে
- নানা রোগ জীবাণু দ্বারা জরায়ু বার বার আক্রান্ত হলেও জরায়ু ক্যান্সারের সম্ভাবনা বেশি থাকে, যেমন- হারপিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস এবং হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস

জরায়ু ক্যান্সারের প্রতিকার ও প্রতিরোধ

প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে চিকিৎসার দ্বারা শতকরা ১০০ ভাগ রোগীই ভালো হয়ে যেতে পারে। রোগের শুরুতে উপসর্গ গুলো অল্পমাত্রায় থাকার কারণে একে কেউ গুরুত্ব দিতে চান না। ক্যান্সারে রূপান্তর হওয়ার পর তা খুব দ্রুত জরায়ুর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তখন অস্ত্রোপচার ও রেডিওথেরাপি ছাড়া কোনো চিকিৎসা থাকে না। স্টেজ এর উপর ভিত্তি করে একেক স্টেজে একেক চিকিৎসা দেয়া হয়।

লক্ষণের উপর নির্ভর করে ব্যথানাশক, এন্টিবায়োটিক, ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়।

যদিও সকল রোগের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ সম্ভব হয়না, তবে জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্ভব। কারণ ডাক্তার অথবা স্বাস্থ্যকর্মী সহজে জরায়ু মুখ দেখতে এবং পরীক্ষা করতে পারেন। মহিলাদের বয়স ৩০ এর বেশি হলেই জরায়ু মুখ অবশ্যই পরীক্ষা করাতে হবে। ১৮ বছরের আগে আর বিবাহিতদের ক্ষেত্রে ২৫ বছর হলেই জরায়ু মুখ পরীক্ষা করাতে হবে। ক্যান্সারপূর্ব অবস্থা ধরা পড়লে সামান্য চিকিৎসার মাধ্যমে ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে জরায়ু ফেলে দেবার প্রয়োজন হয় না এবং চিকিৎসার পর সন্তান ধারণ সম্ভব। হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের জরায়ু ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য এখন টিকা পাওয়া যায়। এছাড়াও নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে জরায়ু ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব-

- টিকা প্রদান করে অবিবাহিত মহিলাদের জরায়ু ক্যান্সার থেকে নিরাপদ রাখা।
- নারীশিক্ষার প্রসার ঘটানো এবং স্বাস্থ্যশিক্ষার ব্যবস্থা করা যাতে, এ রোগ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।
- কোন লক্ষণ চোখে পড়লেই যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা।
- জরায়ু ক্যান্সার সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- নারীদের সাহস জোগাতে এক্ষত্রে পুরুষদেরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।
- ১৮ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত নারীদের বছরে একবার করে পরীক্ষা করা উচিত। তবে পর পর দুইবার রিপোর্ট নেগেটিভ হলে ৩ অথবা ৫ বছর পর পর পুনরায় পরীক্ষা করাবেন। ঝুঁকিপূর্ণ নারীরা ৩ বছর পর পর পরীক্ষা করাবেন। নিয়মিত পরীক্ষা করানোর মাধ্যমে জরায়ু-মুখ ক্যান্সার প্রতিরোধ করা সম্ভব।
- যৌনক্ষমতা বা যৌনমিলন শুরুর পর থেকে তিন বছরের মধ্যে প্রতিটি মহিলাকে একবার প্যাপ স্মেয়ার করে বাকী জীবনের প্রতিবছরে একবার করে এ পরীক্ষা করা দরকার।
- যৌন মিলনের সময় কনডম ব্যবহার করলে এবং একাধিক ব্যক্তির সাথে যৌনসম্পর্ক না রাখলে এই রোগের ঝুঁকি কমানো সম্ভব।
- ধূমপান ত্যাগ করা।

মেয়েদের জরায়ুমুখ ক্যান্সার ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা ও ডোজ শিডিউল

জরায়ুমুখ ক্যান্সারের ভয়াবহতা ও এর প্রতিরোধক টিকা (ভ্যাক্সিন) সম্পর্কে সবার জানা জরুরী। কারণ সারা পৃথিবীতে মেয়েদের ক্যান্সারজনিত মৃত্যুর কারণ হিসাবে জরায়ু ক্যান্সারের অবস্থান ৪র্থ। জরায়ুমুখ ক্যান্সারের কারণ হিসেবে দায়ী করা হয় হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV)-কে। বলা হয়ে থাকে, প্রতিটা মেয়ের হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV) দিয়ে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা সারা জীবনে প্রায় ৮০ শতাংশ।

ভ্যাক্সিন নেয়ার মাধ্যমে জরায়ুমুখের ক্যান্সার (Cervical cancer) প্রায় শতভাগ প্রতিরোধ করা যায়। এই টিকার প্রথম ব্যবহার শুরু হয় অস্ট্রেলিয়াতে ২০০৭ সালে। ২০১৩ সালে US FDA এর অনুমতি দেন। হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের ১৬ ও ১৮ নাম্বার স্ট্রেইনের বিরুদ্ধে এই ভ্যাক্সিন বানানো হয়েছে। ০, ১, ৬ মাস হচ্ছে এই ভ্যাক্সিনের ডোজ শিডিউল। অর্থাৎ প্রথম ডোজ দেয়ার একমাস পর দ্বিতীয় ডোজ এবং প্রথম ডোজের ৬ মাস পরে তৃতীয় ডোজ দিতে হবে।

জরায়ুমুখ ক্যান্সারের ভ্যাক্সিন খুবই কার্যকর। ৩ ডোজের এই ভ্যাক্সিন দেয়ার আদর্শ সময়কাল হচ্ছে বয়স যখন ১১ থেকে ১২ বছর। এই ভ্যাক্সিন অবশ্যই লাইফের প্রথম ইন্টারকোর্স বা যৌন মিলনের আগেই দিতে হবে। কারণ ওই বয়সে সাধারণত শরীর তুলনামূলক ইনফেকশন ফ্রি বা জীবাণুমুক্ত থাকে। বিবাহিতরা ভ্যাক্সিন দিতে চাইলে pap smear নামক টেস্ট করে HPV infection আছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে নিতে হবে। তা না হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। আরেকটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, জরায়ু ক্যান্সারের টিকা জরায়ুতে নয় রবং হাতে দেয়া হয়। গর্ভবর্তী মায়েদের জরায়ু ক্যান্সারের ভ্যাক্সিন দেয়া যাবে না। কেননা গর্ভাবস্থায় এই ভ্যাক্সিন দিলে মা ও জরায়ুর বাচ্চার মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

মজার বিষয় হচ্ছে, এই ভ্যাক্সিন পুরুষদেরও দেয়া যায়। পুরুষ সঙ্গী ভ্যাক্সিন নিলে তার পার্টনার বা স্ত্রী'র জরায়ু ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। শুধুমাত্র ভ্যাক্সিন নয়, গবেষণায় দেখা গেছে পুরুষ সঙ্গীর সুন্নতে খাৎনা (circumcision) করা থাকলেও মহিলাদের জরায়ু ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

মনে রাখতে হবে, এই ভ্যাক্সিন হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV)-এর ইনফেকশন ও ক্যান্সার সারায় না। বরং ভাইরাস দ্বারা ইনফেকশন হওয়া প্রতিরোধ করে। অর্থাৎ ইনফেকশন হতে দেয় না। তাই ইনফেকশন হওয়ার আগেই জরায়ুমুখ ক্যান্সারের ভ্যাক্সিন দেয়া জরুরী। কেননা, এই ভ্যাক্সিন ভয়ংকর ও প্রাণঘাতি ক্যান্সার হওয়ার সম্বাবনাকে শুন্যের কোঠায় নিয়ে আসে।

শেষ কথা

গবেষনায় দেখা গেছে যেসব মহিলা প্রতি বছরে একবার প্যাপ স্মেয়ার করান তাদের এ ক্যান্সারে মারা যাওয়ার ঝুঁকি ৪১ শতাংশ কমে যায়। শিল্পোন্নত দেশগুলোতে গত ৪০ বছরে এ ক্যান্সারে মারা যাওয়ার ঝুঁকি আক্রান্তের সংখ্যা অনেক কমে গেছে শুধু নিয়মিত স্ক্রিনিং বা প্যাপ স্মেয়ার পরীক্ষা করার কারণে। বিয়ের পূর্বেই জরায়ু ক্যান্সারের টিকা দেওয়া উচিত। আর বিয়ের পর নিয়মিত চেক আপ ভয়াবহ ক্যান্সার থেকে মুক্তি দিতে পারে।

তথ্যসূত্র

❑ স্কয়ার

রিকেটস

রিকেটস (Rickets) একটি শৈশবকালীন হাড়ের ব্যধি যেখানে হাড়গুলো নরম হয়ে যায়, হাড়ভাঙ্গা এবং হাড় বিকৃতি হয়ে পড়ে। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এটি বিরল, তবে কিছু উন্নয়নশীল দেশে মোটামুটি সাধারণ। এটি এমন একটি অবস্থা যা সাধারণত অপুষ্টির সাথে যুক্ত।

ভিটামিন ডি-এর অভাবে এটি হয়। শিশুর জন্মের পর এবং গর্ভাবস্থায় তার হাড়ের গঠনের জন্য ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের প্রয়োজন হয়। ভিটামিন ডি-এর কাজ হলো দেহের ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসকে সুষ্ঠভাবে কাজ করতে সাহায্য করা।

কিন্তু কোনো কারণে ভিটামিন ডি-এর অভাব হলে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস হাড়ের গঠনে ঠিকমতো অংশ নিতে পারে না। ফলে হাড় বাঁকা হয়ে যায়। চিকিৎসা পরিভাষায় একে রিকেটস বলে। সাধারণতঃ এক বছর বয়সে রিকেটস দেখা যায়।

রোগের প্রকার

- ভিটামিন ডি সম্পর্কিত রিকেটস
  - ভিটামিন ডি ঘাটতি রিকেটস
  - ভিটামিন ডি-নির্ভর রিকেটস
    - টাইপ ১ (২৫-হাইড্রক্সিভিটামিন ডি৩ ১-আলফা-হাইড্রক্সিলেস ঘাটতি)
    - টাইপ ২ (ক্যালসিট্রিয়ল গ্রাহক)
- হাইপোক্যালসিমিয়া সম্পর্কিত রিকেটস
  - হাইপোক্যালসিমিয়া
  - ক্রনিক রেনাল ফেইলিউর
- হাইপোফসফেটেমিয়া সম্পর্কিত রিকেটস
  - হাইপোফসফেটেমিয়া
  - ফ্যাঙ্কোনিজ সিনড্রোম
- অন্যান্য রোগ থেকে উৎপত্তি

ভিটামিন ডি-এর অভাব কেন হয় ?

ভিটামিন ডি ত্বকের নিচে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। ত্বকে সূর্যের আলো পড়লে তার অতি বেগুনি রশ্মির সাহায্যে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে ভিটামিন ডি সক্রিয়রূপ লাভ করে। শিশু ছয় মাস বয়স পর্যন্ত মায়ের দুধ থেকে ক্যালসিয়াম পেয়ে থাকে এবং গর্ভে থাকা অবস্থায় শিশুর দেহে যে পরিমাণ ক্যালসিয়াম জমা হয় তা শিশুকে এক বছর পর্যন্ত এ রোগ থেকে দূরে রাখে। কিন্তু এক বছর পর শিশু যদি সূর্যের আলো থেকে বঞ্চিত হয় অর্থাৎ তার ত্বকে যদি সূর্যের আলো না লাগে তাহলে কার্যকর ভিটামিন ডি তৈরী হতে পারে না। ফলে ভিটামিন ডি-এর অভাব ঘটে।

বয়স

৬ থেকে ৩৬ মাস বয়সী শিশুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। এই সময়ের মধ্যে, শিশুরা সাধারণত দ্রুত বর্ধনশীল হয়। এটি তখনই হয় যখন তাদের দেহের হাড়কে শক্তিশালী করতে এবং বিকাশের জন্য সর্বাধিক ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের প্রয়োজন হয়।

এপিডেমিওলজি

মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা এবং এশিয়াতে তুলনামূলকভাবে রিকেটস দেখা যায়। উন্নত দেশগুলিতে রিকেটস একটি বিরল রোগ (২০০,০০০ এর মধ্যে ১ জনেরও কম)। কিছু সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ব্যতীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে সাধারণত এটি অস্বাভাবিক। সম্প্রতি, বাচ্চাদের মধ্যে পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি খাওয়ানো হয় না তাদের মধ্যে রিকেটসের ঘটনা ঘটেছে। ২০১৩/২০১৪ সালে ইংল্যান্ডে ৭০০ এরও কম ছিল। রোগের হার পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সমান।

ঝুঁকির কারণগুলি কী কী?

- অকাল জন্ম (ভিটামিন ডি, ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস এর অভাব)
- সীমিত সূর্যের এক্সপোজার (বিশেষত উচ্চ এবং নিম্ন অক্ষাংশে)
- বংশগত বিপাকীয় রোগ
- ভিটামিন ডি অভাবজনিত মায়েদের জন্মগ্রহণকারী শিশুরা
- রেনাল (কিডনী) রোগ যা ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস শোষণকে প্রভাবিত করে
- অপুষ্টি

উচ্চ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে যারা

- বুকের দুধ খাওয়ানো শিশুরা যাদের মায়েরা সূর্যের আলোতে যায় না
- বুকের দুধ খাওয়ানো বাচ্চারা যারা সূর্যের আলোয় যায় না
- বুকের দুধ খাওয়ানো বাচ্চারা, যারা খুব কম সূর্যের আলোয় থাকে
- কিশোর-কিশোরীরা, বিশেষত যখন যৌবনের বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে যায়
- যে কোনও শিশু ডায়েটে পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি বা ক্যালসিয়াম নেই

উপসর্গ বা লক্ষণ

লক্ষণগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেঃ

- শিশু অস্থির কোমলতা
- মাংসপেশি থলথলে হয়
- শিশুর মাথা ঘামতে থাকে
- পেট ফুলে যায়
- শিশুর প্রায়ই শ্বাসতন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্রের সংক্রমণ ঘটে
- শিশুর বৃদ্ধি দেরিতে হয়
- দেরিতে দাঁত ওঠে
- শিশু তার স্বাভাবিক বয়সে বসতে, দাঁড়াতে, হামাগুড়ি দিতে ও হাঁটতে পারে না
- শিশুর মাথার তালুর নরম জায়গা স্বাভাবিকের চেয়ে বড় থাকে এবং শক্ত হয়ে উঠতে দেরি হয়
- বুকের পাঁজরের সামনে হাড় ও তরুণাস্থির সংযোগস্থল ফুলে যায়

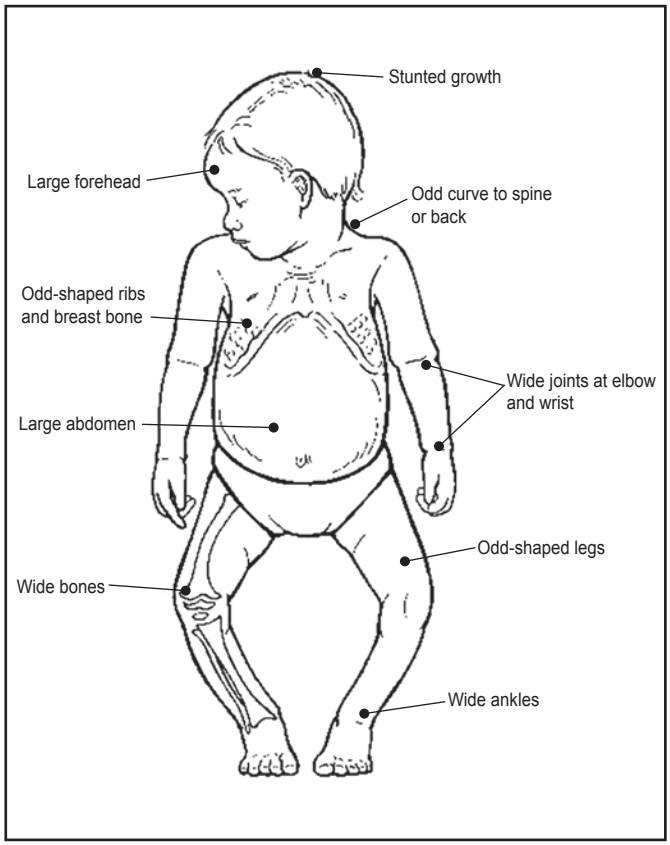

- হাতের হাড় রেডিয়াসের নিম্নপ্রান্ত মোটা হয়ে যায়
- শিশুর পায়ের হাড় ধনুকের মতো বেঁকে যায়
- শরীরের অন্যান্য হাড়েরও বিকৃতি ঘটে

রোগ নির্ণয়

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ডায়াগনোসিস পুরো ইতিহাস এবং শারীরিক পরীক্ষা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। রিকেটস রোগ নির্ণয় করতে সহায়তা করার জন্য কয়েকটি পরীক্ষার দরকার হতে পারেঃ

- **রক্ত পরীক্ষাঃ** এই পরীক্ষাগুলি ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের মাত্রা পরিমাপ করে।
- **এক্স-রেঃ** এগুলি হাড়ের ক্যালসিয়ামের ক্ষয় বা হাড়ের গঠন বা আকারে পরিবর্তনের বিষয়টি প্রকাশ করতে পারে।
- **হাড়ের বায়োপসিঃ** এটি রিকেটসগুলি নিশ্চিত করতে পারে তবে খুব কমই ব্যবহৃত হয়।

চিকিৎসা

রিকেটসের সর্বাধিক সাধারণ চিকিৎসা হল ভিটামিন ডি ব্যবহার, তবে গুরুতর হাড়ের অস্বাভাবিকতাগুলি অপসারণের জন্য শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে।

যদি রিকেটস দুর্বল ডায়েটের কারণে হয় তবে রোগীকে প্রতিদিন ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি পরিপূরক এবং বার্ষিক ভিটামিন ডি ইঞ্জেকশন দেয়া, পাশাপাশি ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ খাবার খেতে উৎসাহিত করা।

জিনগত কারণযুক্ত রিকেটস চিকিৎসা করার সময়, রোগীকে সক্রিয় ভিটামিন ডি হরমোন দেওয়া।

রিকেটসের যদি কিডনী রোগের মতো অন্তর্নিহিত চিকিৎসার কারণ থাকে তবে সেই রোগটির চিকিৎসা এবং নিয়ন্ত্রণ করা।

জটিলতা

যদি চিকিৎসা না করা হয়, রিকেটসযুক্ত একটি শিশু হাড়ের ভাঙ্গার ঝুঁকিতে বেশি থাকতে পারে। আরও মারাত্মক এবং দীর্ঘায়িত রিকেটসযুক্ত লোকেরা স্থায়ী হাড়ের বিকৃতি অনুভব করতে পারে। রক্তে মারাত্মকভাবে কম ক্যালসিয়ামের স্তরগুলি ক্র্যামস, খিঁচুনি এবং শ্বাসকষ্টের সমস্যা হতে পারে। বিরল ক্ষেত্রে, রিকেটস হৃৎপিণ্ডের পেশীগুলিকে দুর্বল করতে পারে।

প্রতিরোধ

রিকেটস যাতে না হয় তার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন-

- শিশুকে সূর্যালোকে রাখতে হবে।
- মুখে ভিটামিন ডি খাওয়াতে হবে।
- শিশু অপরিণত হলে তার জন্ম নেয়ার দুই সপ্তাহ পর থেকে তাকে ভিটামিন ডি দিতে হবে।
- গর্ভবতী মহিলা ও স্তন্যদানকারী মাকে ভিটামিন ডি দিতে হবে।
- শিশুর প্রথম বছরেই ভিটামিন ডি-সমৃদ্ধ দুধ খাওয়াতে হবে।
- শিশুকে ভিটামিন ডি-সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে।
- শিশুকে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত অবশ্যই বুকের দুধ দিতে হবে।

তথ্যসূত্র

- স্কয়ার

পেভিটিন® ক্রীম
ইকোনাজোল নাইট্রেট বিপি এবং ট্র্যায়ামসিনোলোন বিপি

উপাদান

পেভিটিন® ক্রীম : প্রতি গ্রাম ক্রীমে আছে ১০ মি.গ্রা. ইকোনাজোল নাইট্রেট বিপি এবং ১ মি.গ্রা. ট্র্যায়ামসিনোলোন এসিটোনাইড বিপি।

ফার্মাকোলজি

ইকোনাজোল নাইট্রেট একটি বিস্তৃত বর্ণালীর ছত্রাকনাশক, যা অসংখ্য গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী।

ট্র্যায়ামসিনোলোন এসিটোনাইড একটি প্রদাহরোধী, চুলকানীরোধী এবং এন্টিএলার্জিক সক্রিয় কর্টিকোস্টেরয়েড।

নির্দেশনা

ত্বকীয় প্রদাহী ডার্মাটোমাইকোসিস এবং প্রদাহী ত্বকীয় সমস্যাগুলি, যেখানে ব্যাকটেরিয়া অথবা ছত্রাক আক্রমণের ভয় থাকে, সেগুলি চিকিৎসার জন্য নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

আক্রান্ত স্থানে মৃদুভাবে দিনে দুইবার ১৪ দিন পর্যন্ত ক্রীমটি মালিশ করুন অথবা চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করুন।

সতর্কতা এবং যে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না

অন্যান্য কর্টিকোস্টেরয়েড প্রস্তুতির মতো ক্রীমটি টিউবারকুলার বা লিউটিক ত্বকীয় ক্ষততে অথবা ভাইরাসজনিত রোগে (যেমন- হার্পিস, ভ্যাকসিনিয়া, ভ্যারিসেলা) ব্যবহার করা উচিত নয়। যেসব রোগীর পূর্বেই ইমিডাজোল বা কর্টিকোস্টেরয়েডের প্রতি অতিসংবেদনশীলতা রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে ক্রীমটি প্রয়োগ করা উচিত নয়।

দীর্ঘমেয়াদী স্টেরয়েড থেরাপি উপেক্ষা করা উচিত, কারণ অ্যাড্রেনাল সাপ্রেশন ঘটতে পারে, বিশেষত যখন শিশু কিশোরদের চিকিৎসা করা হয় অথবা বদ্ধ ব্যান্ডেজ থাকে। উপরন্তু দীর্ঘমেয়াদী কর্টিকোস্টেরয়েড থেরাপি ত্বকীয় ক্ষত; যথা- এ্যাট্রোপি, ট্যালেনজেক্টেসিয়া এবং স্ট্রায়া ঘটাতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

স্থানীয় মৃদু জ্বালাপোড়া হতে পারে। অতিসংবেদনশীলতা খুব কম দেখা যায়।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

এখন পর্যন্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

সংরক্ষণ

ঠাণ্ডা ও শুষ্ক স্থানে সংরক্ষণ করুন। আলো থেকে দূরে রাখুন। ফ্রিজে রাখা যাবে না।

সরবরাহ

পেভিটিন® ক্রীম : প্রতি প্যাকে রয়েছে ১০ গ্রামের একটি টিউব।

নোমি®
জলমিট্রিপ্টান

উপাদান

প্রতিটি ফিল্ম কোটেড ট্যাবলেটে আছে জলমিট্রিপ্টান আইএনএন ২.৫ মি.গ্রা.।

ফার্মাকোলজি

করোটির নির্দিষ্ট রক্তনালীর প্রসারণ বা ট্রাইজেমিনাল সিস্টেমে স্নায়ুপ্রান্তে সেনসরি নিউরোপেপটাইড নিঃসরণের ফলে মাইগ্রেনের ব্যথা অনুভূত হয়। **নোমি®** করোটির রক্তনালী এবং ট্রাইজেমিনাল সিস্টেমে সেনসরি স্নায়ুর $5\text{-}HT_{1B/1D}$ রিসেপ্টরের আনুকূল্যে প্রভাব বিস্তার করার মাধ্যমে রক্তনালীর সংকোচন ও প্রদাহ সৃষ্টিকারী নিউরো পেপটাইড নিঃসরণ বাধাগ্রস্থ করে মাইগ্রেন নিরাময়ে কার্যকারিতা প্রদর্শন করে।

নির্দেশনা

নোমি® অরা সহ অথবা অরা ব্যতীত মাইগ্রেনের তাৎক্ষণিক চিকিৎসায় নির্দেশিত।

মাত্রা ও ব্যবহারবিধি

নোমি® গ্রহণের সুপারিশকৃত প্রারম্ভিক মাত্রা ২.৫ মি.গ্রা.। একবার গ্রহণে সর্বোচ্চ অনুমেদিত মাত্রা ৫ মি.গ্রা.। **নোমি®** গ্রহণের ২ ঘন্টার মধ্যে যদি ব্যথা উপশম না হয় অথবা সাময়িক উপশমের পর ব্যথা ফিরে আসে, সেক্ষেত্রে প্রথমবার গ্রহণের ন্যূনতম ২ ঘন্টা পর দ্বিতীয় মাত্রা গ্রহণ করা যেতে পারে। দৈনিক সর্বোচ্চ মাত্রা ১০ মি.গ্রা.।

প্রতিনির্দেশনা

ইস্কেমিক করোনারী আর্টারি ডিজিজ ও স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগী, মনোঅ্যামাইনো অক্সিডেজ ইনহিবিটর জাতীয় ওষুধ গ্রহণকারী এবং জলমিট্রিপ্টান এর প্রতি অতি সংবেদশীল ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

সর্তকতা ও সাবধানতা

জলমিট্রিপ্টান গ্রহণের পর বিরল ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডের ওপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া যেমন- মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হতে পারে। এছাড়া বুকে, গলায় ঘাড়ে ও চোয়ালে টান, ব্যথা এবং চাপ অনুভূত হতে পারে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

সাধারণত ঘাড়ে বা গলায় ব্যথা ও চাপ, মাথা ঘোরানো, হাত-পা জ্বালাপোড়া, শারীরিক দুর্বলতা, নিদ্রাল্পতা, গরম/ঠাণ্ডা অনুভূতি, বমিভাব, ভার অনুভব ও মুখে শুষ্কতা পরিলক্ষিত হয়।

বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় ঃ প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি-সি। জলমিট্রিপ্টান ব্যবহারে ভ্রুণের ঝুঁকির তুলনায় ওষুধের উপকারিতা বেশী প্রমাণিত হলে গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে।

স্তন্যদানকালে ঃ জলমিট্রিপ্টান মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় কিনা জানা যায়নি। মায়ের জন্যে ওষুধের গুরুত্ব বিবেচনা করে স্তন্যপান বা ওষুধ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

শিশুদের ক্ষেত্রে ঃ ১৮ বছরের নীচে রোগীদের ব্যবহার অনুমোদিত নয়।

সংরক্ষণ

আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে, ৩০° সে তাপমাত্রার নীচে সংরক্ষণ করুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

প্রতিটি বাক্সে আছে ১২ টি ট্যাবলেট ব্লিষ্টার প্যাকে।

ডি-ব্যালেন্স™ লিক্যাপ

কোলেক্যালসিফেরল

উপাদান

ডি-ব্যালেন্স™ ২০০০ লিক্যাপ : প্রতিটি লিকুইড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুলে আছে কোলেক্যালসিফেরল ইপি ২০০০ আই ইউ।

ডি-ব্যালেন্স™ ২০০০০ লিক্যাপ : প্রতিটি লিকুইড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুলে আছে কোলেক্যালসিফেরল ইপি ২০০০০ আই ইউ।

ডি-ব্যালেন্স™ ৪০০০০ লিক্যাপ : প্রতিটি লিকুইড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুলে আছে কোলেক্যালসিফেরল ইপি ৪০০০০ আই ইউ।

ডি-ব্যালেন্স™ ৫০০০০ লিক্যাপ : প্রতিটি লিকুইড হার্ড জিলাটিন ক্যাপসুলে আছে কোলেক্যালসিফেরল ইপি ৫০০০০ আই ইউ।

বর্ণনা

ডি-ব্যালেন্স™ কোলেক্যালসিফেরলের একটি প্রিপারেশন যা ভিটামিন ডি৩ এর সংশ্লেষিত আকার। হাড়ের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, উন্নতি এবং ঘনত্ব বজায় রাখতে কোলেক্যালসিফেরল একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এটি আমাদের শরীরে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের পুনঃশোষণ বৃদ্ধি করে।

নির্দেশনা এবং ব্যবহার

কোলেক্যালসিফেরলের অভাব জনিত রোগের চিকিৎসা এবং প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থায় ব্যবহৃত।

মাত্রা এবং সেবন বিধি

পূর্ণ বয়স্কদের জন্যঃ

কোলেক্যালসিফেরলের অভাব পূরণেঃ ৪০,০০০-৫০,০০০ আই ইউ প্রতি সপ্তাহে একবার (০১) করে মোট সাত (০৭) সপ্তাহ ও পরবর্তীতে থেরাপি মেইনটেইন করতে ১,৪০০-২,০০০ আই ইউ করে প্রতিদিন। মেইনটেইনেন্স থেরাপি শুরুর ৩-৪ মাস পরে ২৫ (ও এইচ) ডি পরিমাপ করে কোলেক্যালসিফেরলের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে। ভিটামিন ডি এর অভাব প্রতিরোধেঃ ২০,০০০ আই ইউ করে প্রতি মাসে এক বার।

শিশুদের জন্য

কোলেক্যালসিফেরলের অভাব পূরণেঃ

১২-১৮ বৎসর ঃ ২০,০০০ আই ইউ প্রতি দুই সপ্তাহে এক বার করে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত।

ভিটামিন ডি এর অভাব প্রতিরোধেঃ

১২ -১৮ বৎসর ঃ ২০,০০০ আই ইউ করে প্রতি ছয় সপ্তাহে একবার।

নির্দেশনা

- কোলেক্যালসিফেরল বা এর জন্য কোন সহ উপাদানের প্রতি সংবেদনশীলতা।
- হাইপারভিটামিনোসিস ডি
- নেফ্রোলিথিয়াসিস
- হাইপারক্যালসেমিয়া এবং/অথবা হাইপারক্যালসিইউরিয়া
- মারাত্মক বৃক্কীয় বিকলতায়

সতর্কতা

বৃক্কীয় বিকলতা রয়েছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে কোলেক্যালসিফেরল সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি তাদের ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসের মাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হৃদরোগীদের ক্ষেত্রে কোলেক্যালসিফেরল সাবধানতার সাথে নির্দেশিত। কারণ, এটি ডিজিটালিস ঘটিত বিষক্রিয়া (এ্যারিদমিয়া) বৃদ্ধি করতে পারে। সারকোয়ডোসিস রোগীদের ক্ষেত্রেও কোলেক্যালসিফেরল সাবধানতার সাথে নির্দেশিত। কোলেক্যালসিফেরলের সম্পূরক হিসেবে ব্যবহারের পর বৃক্কীয় পাথর ঘটিত কোন পূর্ণাঙ্গ তথ্য গবেষণায় পাওয়া যায়নি। তবে ক্যালসিয়ামের অন্য কোন সম্পূরক উপাদান ব্যবহারে ঝুঁকি থাকতেও পারে। চিকিৎসাকালীন সময়ে হাইপারক্যালসেমিয়া প্রতিরোধে চিকিৎসকের প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধায়ন কাম্য।

অন্য ওষুধের সাথে প্রতিক্রিয়া

কার্বামাজেপিন, ডাকটিনোমাইসিন, ডাইইউরেটিকস, ফসফিনাইটইন, মাইকোনাজল, ফেনোবারবিটাল, ফিনাইটইন, প্রিমিডোন এর সাথে কোলেক্যালসিফেরল প্রতিক্রিয়া করে বলে জানা গিয়েছে।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

বিপাকীয় এবং পুষ্টিজনিত সমস্যা ঃ নগন্য (<১/১০০০ থেকে <১/১০০)ঃ হাইপার ক্যালসেমিয়া এবং হাইপার ক্যালসিউরিয়া। পরিপাক তন্ত্রের সমস্যা ঃ বিরল (<১/১০০০ থেকে <১/১০০) ঃ কোষ্ঠ্যকাঠিন্য, পেটফাপা, পেটে বায়ু জমা, বমি ভাব, তলপেটে ব্যথা এবং ডায়রিয়া। ত্বক এবং অধঃত্বকের সমস্যা ঃ বিরল (<১/১০০০ থেকে <১/১০০) ঃ চুলকানি, ফুঁসকুড়ি এবং আর্টিকারিয়া (ফুঁসকুড়ি)।

গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদানকালে

গবেষণায় দেখা গেছে, গর্ভাবস্থায় ৪০০০ আই ইউ পর্যন্ত কোলেক্যালসিফেরল নিরাপদ। গর্ভবতীদের জন্য নির্দেশিত দৈনিক সেবন মাত্রা ৪০০ আই ইউ। তবে যে সব নারীদের কোলেক্যালসিফেরলের ঘাটতি রয়েছে তারা বেশি মাত্রায় সেবন করতে পারে। গর্ভবতীদের উচিত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কোলেক্যালসিফেরল সেবন করা। কারণ, রোগের ধরন এবং চিকিৎসায় সাড়াদানের উপর তাদের কোলেক্যালসিফেরলের চাহিদার তারতম্য হতে পারে। কোলেক্যালসিফেরল এবং এর বিপাককৃত উপাদান গুলো বুকের দুধে নিঃসরিত হয়। বুকের দুধ পানরত নবজাতকদের মধ্যে কোলেক্যালসিফেরলের মাত্রাধিক্যতা পরিলক্ষিত হয়নি। তারপরও বুকের দুধ পানরত শিশুদের কোলেক্যালসিফেরলের সেবনমাত্রা বৃদ্ধির সময় মায়ের কোলেক্যালসিফেরলের সেবন মাত্রার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সংরক্ষণ

আলো ও আর্দ্রতা থেকে দূরে ৩০° সেঃ তাপমাত্রার নিচে সংরক্ষণ করুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহ

ডি-ব্যালেন্স™ ২০০০ লিক্যাপ : প্রতিটি বাক্সে ৩০টি লিক্যাপ আছে অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

ডি-ব্যালেন্স™ ২০০০০ লিক্যাপ : প্রতিটি বাক্সে ১০টি লিক্যাপ আছে অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

ডি-ব্যালেন্স™ ৪০০০০ লিক্যাপ : প্রতিটি বাক্সে ১০টি লিক্যাপ আছে অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

ডি-ব্যালেন্স™ ৫০০০০ লিক্যাপ : প্রতিটি বাক্সে ১০টি লিক্যাপ আছে অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

D-balance™
Cholecalciferol EP
2000 IU
20000 IU
40000 IU
Licap
Create Your Own Sunshine
Prevention & treatment of
Vitamin-D deficiency & associated diseases like
Fractures
Rickets
Osteomalacia
Preeclampsia
Diabetic & cardiovascular management
Since 1958
SQUARE
PHARMACEUTICALS LTD.
BANGLADESH
www.squarepharma.com.bd
SQUARE

মাথা ব্যথার তাৎক্ষনিক সমাধানে
USFDA স্বীকৃত ঔষধ
Nomi®
Zolmitriptan 2.5 mg Tablet
সেবন বিধি: মাথা ব্যথার লক্ষণ নিরাময়ে দৈনিক ১ টি ট্যাবলেট যথেষ্ট
Keeping Neuron Active™
Since 1958
SQUARE
PHARMACEUTICALS LTD.
BANGLADESH
www.squarepharma.com.bd
SQUARE

Everyday about

30 lacs people of Bangladesh

intake **Seclo®** Capsule

to treat **hyper-acidity**

Seclo®

Omeprazole

The Royal Antiulcerant

Ref.: Data on file

Since 1958

SQUARE PHARMACEUTICALS LTD. BANGLADESH

www.squarepharma.com.bd

facebook.com/SquarePharmaLtd

twitter.com/SquarePharmaBD

SQUARE

মেডিকেল সার্ভিসেস বিভাগ, স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, কর্পোরেট হেড কোয়ার্টার: স্কয়ার সেন্টার
৪৮, মহাখালী বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২, ফোন : ৮৮৩৩০৪৭-৫৭, ৮৮৫৯০০৭ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৮২ ৮৬০৮, ৮৮২ ৮৬০৯
E-mail : info@squaregroup.com, Web : http://www.squarepharma.com.bd

Production: Rains.Com